মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৫

জুন ২০১৫ ইং, শা'বান ১৪৩৬ হি., জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বাং | شعبان ١٤٣٦يونيو ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬ ..... ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৭
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
বেমালুম ভুলে যাওয়া ফজীলতপূর্ণ একটি মাস..... ৮
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
টিভি প্রোগ্রামে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ... ১০
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মাহে রমাজান ও রোযা : তাৎপর্য ফজীলত মাসায়েল ১৪
মুফতী শাহেদ রহমানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৭..... ২১
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাত..... ২৩
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
পোশাক সংস্কৃতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা..... ২৯
মাওলানা কাসেম শরীফ
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৪..... ৩৩
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৩..... ৪১
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

ওয়া বাল্লিগনা রামাজান

আমরা এখন পবিত্র মাহে শা'বান প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। সামান্য এগোলেই ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাব মহান ফজীলতের মাস রমাজানুল মোবারকের দোরগোড়ায়। রাসূল (সা.) সময়ের এই স্থানে পৌঁছেও বলতেন, وبلغنا رمضان 'আমাদেরকে রমাজানের সৌভাগ্য দান করো।' পবিত্র রমাজানের আশা, প্রতীক্ষা এবং অপেক্ষায় প্রহর গুনতেন তিনি। উম্মতকেও দিয়েছেন এই অপেক্ষা ও প্রতীক্ষার শিক্ষা। রজব মাস এলেই বলতে শিখিয়েছেন–

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব এবং শা'বান মাসকে বরকতময় করো এবং রমাজানে পৌঁছার সৌভাগ্য দান করো।' এটি উম্মতের জন্য একটি বড় শিক্ষা। অর্থাৎ রমাজানের গুরুত্ব ও ফজীলত এত অসীম, এর জন্য তোমরা প্রতীক্ষায় থাকো, প্রস্তুতি নাও এবং ওই মহাপ্রান্তরে পৌঁছতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো।

রমাজান আসলে কী?

আল্লাহ তা'আলা রমাজানকে নিজের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এই মাস কোরআনের মাস। এই মাস রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মাস।

পুরো বছর মানুষ দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের পেছনে ছুটে বেড়ায়, তারা এই দীর্ঘ সময় নিবিড়ভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের মুজাহাদায় লিপ্ত থাকতে পারে না। অলসতা আর গাফিলতিতে জড়িয়ে অনেক সময় মাওলার কথা বেমালুম ভুলে যায়। এই আবিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সিঁড়ি হলো এই পবিত্র রমাজান মাস।

এই মাসে অদৃশ্যজগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা করা হয় এর বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ:

'যখন রমাজান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।" (বুখারী ৪/১৩২, মুসলিম হা. ২/৭৫৮ হা. ২৫৪৭)

রোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

قَالَ اللَّهُ :كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের প্রতিটি ভালো কাজ নিজের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু রোযা শুধুমাত্র আমার জন্য। অতএব আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। (বুখারী ৩/২৬, হা. ১৯০৪)

মাসটি আল্লাহর নিজের মাস, রোযার প্রতিদানও আল্লাহ তা'আলা নিজে দিয়ে থাকেন। বান্দা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলাকে কাছে পাওয়ার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে? যারা এই সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের নিয়ামত অর্জন করতে সক্ষম হবে, দুনিয়াতে তার মতো সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

বান্দা যেন আল্লাহর অপার রহমত, বরকত ও নিয়ামতে সিক্ত হতে পারে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে উভয় জাহানে কামিয়াবী হাসিল করতে সক্ষম হয়, এই প্রচেষ্টাই ছিল পেয়ারা নবী রাহমাতুলল্লিল আলামীন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর। আর সে কারণেই তিনি রমাজানের পূর্ব থেকে এ মাসের ফজীলত পরিপূর্ণভাবে অর্জনে প্রস্তুতি গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের উচিত এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, পবিত্র রমাজানটা কিভাবে পরিপূর্ণ হক আদায় করে পালন করা যায়। দুনিয়াবী সর্বপ্রকারের ঝামেলামুক্ত হয়ে কিভাবে পুরো রমাজান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে কাটানো যায়।

সলফে সালেহীন এবং আকাবিরগণ এই মাসকে সঠিকভাবে পালনের জন্য মসজিদভিত্তিক জীবনকেই বেঁচে নিতেন। দুনিয়াবী সর্বপ্রকার ঝামেলামুক্ত হয়ে ৩০ দিনের ই'তিকাফ শুরু করতেন। আবার অনেকে রমাজানের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে আগে ১০ দিন যুক্ত করে ৪০ দিনের ই'তিকাফ করতেন। যেহেতু ৪০ দিনের একটি আলাদা গুরুত্ব আছে, তাই উক্ত বর্ধিত ফজীলত অর্জনও তাদের উদ্দেশ্য থাকত। এমনিভাবে তাদের পুরো রমাজান রিয়াজাত মুজাহাদার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হতো। বর্তমান দুনিয়ায় যে সকল মহামনীষী আত্মগরিমায় মুসলমানদের মানসপটে এখনও ভাস্বর, তাঁরা প্রত্যেকে এরূপ রিয়াজাত মুজাহাদার মাধ্যমেই সফলকাম হয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সব কিছু আছে, সব কিছুই এখন সহজলভ্য। কিন্তু আকাবিরদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবির অভাব, সলফে সালেহীন মহামনীষীদের যোগ্য প্রতিকৃতি খুবই দুস্প্রাপ্য।

বর্তমান প্রজন্মে এরূপ মহামনীষীদের যে বিয়োগ ও দুস্প্রাপ্যতা আরম্ভ হয়েছে, আল্লাহই ভালো জানেন এ জাতির ভবিষ্যৎ গন্তব্য কোন পথে!

এ প্রজন্মের কর্ণধারগণ, বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের হলকা যদি এখনও আকাবিরদের ওই নকশে কদমে মানব-গঠনে সচেষ্ট হয়, তবে আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ এই অভাব কিছুটা হলেও দূরীভূত হবে।

পবিত্র মাহে রমাজান সমাগত। এই মাসকে কেন্দ্র করে উলামায়ে কেরাম যদি আকাবিরদের রমাজান পরিপালনের বিষয়গুলো নিজ নিজ হলকায় চর্চা আরম্ভ করেন; তবে পুরো উম্মাহের জন্য তা কল্যাণের বার্তা বয়ে আনবে। কেটে যাবে শূন্যতাও।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৫/০৫/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (٤٣) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (٤٥) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤٧)

(৪২) জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। (৪৩) তারা মস্তক ওপরে তুলে ভীত-বিহ্বলচিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। (৪৪) মানুষকে ওই দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালিমরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা তাদের সবরকম চক্রান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল। হোক না তাদের চক্রান্তসমূহ এমন যাতে পাহাড়ও টলে যায়। (৪৭) অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রাসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী।

এখানে প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং জালিমকে কঠোর আযাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং তারা যা কিছু করছে সব আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও হিকমতের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

ولا تحسبن الله غافلا অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফিল মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফিলতি এবং শয়তান-এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালিমদের ওপর তাৎক্ষণিক আযান না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আযাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।

ليوم تشخص فيه الابصار অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক ওপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لا يرتد اليهم طرفهم অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে افئدتهم هواء তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ওই দিনের শাস্তির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবে, এখন তোমরা এ কথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলোনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগৎ অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে وانذر الناس বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্য বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা করো। তোমরা এ কথাও জানো যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এ ছাড়া আমিও তোমাদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এর পরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হলো না।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কূটকৌশল করেছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের এসব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে। কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধগ্রহণকারী। তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

হাদীস নং ১৭ :

عن أبى هريرة -رضى الله عنه -قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ينادى مناد يوم القيامة :أين أولو الألباب؟ قالوا :أيٍ أولى الألباب تريد؟ قال :الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار، عقد لهم لواء فاتبع القوم لواء هم وقال لهم :ادخلوها خالدين

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করবে, বুদ্ধিমান লোক কারা? উত্তরে বলা হইবে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহর যিকির করত। আর আসমান-জমিনের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করত। আর বলত, হে আল্লাহ! আপনি এই সব কিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার তাসবীহ পড়ি। আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম হতে বাঁচিয়ে দিন। অতঃপর এ সকল লোকের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈরি করা হবে এবং তারা সে ঝাণ্ডার পেছনে চলবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন– যাও, তোমরা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।

(দুররে মনসূর ২/৪০৭, আততারগীব ওয়াত তারহীব [ইসবাহানী] ১/৩৮৭, হা. ৬৬৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. ইবনে আবিদ-দুনিয়া একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআতের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁরা সকলে চুপচাপ বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কী চিন্তা করছ? তাঁরা আরজ করলেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তা করছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ ফরমালেন, হ্যাঁ আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করো না। কেননা তিনি ধারণার অতীত। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো।

وأخرج ابن أبى الدنيا عن عثمان بن أبى دهرش قال " بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون فقال :ما لكم لا تتكلمون ؟ !قالوا :نتفكر فى خلق الله قال :كذلك فافعلوا تفكروا فى خلقه ولا تفكروا فيه

(দুররে মনসূর ২/৪০৮, ইবনে কাসীর ৮/১৫৭)

হাদীসটির মান : হাসান।

খ. হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি আরজ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো আশ্চর্য কথা আমাকে শুনিয়ে দিন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর কোন কথাটি এমন ছিল, যা আশ্চর্য নয়। একবার তিনি রাত্রে তাশরীফ আনলেন এবং আমার বিছানায় লেপের নিচে শুয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তিনি বলতে লাগলেন, আমাকে ছাড়, আমি আমার পরোয়ারদিগারের ইবাদত করব। এ কথা বলেই তিনি উঠে গেলেন। ওজু করে নামাযের নিয়্যাত বাঁধলেন এবং নামাযের মধ্যে এত বেশি কাঁদতে লাগলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর সিনা মোবারক ভিজে গেল। অতঃপর রুকুতেও এভাবে কাঁদলেন। সিজদাতেও এভাবে কাঁদলেন। সারা রাত তিনি এভাবে কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। ফজরের সময় হযরত বেলাল (রা.) এসে ডাক দিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন, তবু আপনি এত বেশি কাঁদলেন কেন? তিনি

ইরশাদ করলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হব না? অতঃপর তিনি আরো ইরশাদ করলেন, আমি কেন কাঁদব না, আজই তো আমার ওপর এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে–

ان فى خلق السمٰوٰت والارض--- فقنا عذاب النار

অতঃপর ইরশাদ করলেন, ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে অথচ চিন্তা-ফিকির করে না।

হাদীসটির মান : হাসান

عَن عَطاء قَالَ قلت لعَائشَة أَخبرِينِي بِأَعْجَب مَا رَأَيْت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم قَالَت :وَأى شَأْنه لم يكن عجبا إِنَّه أَتَانِى لَيْلَة فَدخل معى فِى لِحَافِى ثمَّ قَالَ :ذَرِينِى أَتعبد لِرَبِّى فَقَامَ فَتَوَضَّأ ثمَّ قَامَ يُصَلِّى فَبكى حَتّٰى سَالَتْ دُمُوعه على صَدره ثمَّ رَكع فَبكى ثمَّ سجد فَبكى ثمَّ رفع رَأسه فَبكى فَلم يزل كَذَلِك حَتّٰى جَاءَ بِلَال فَآذنه بِالصَّلَاة فَقلت :يَا رَسُول الله مَا يبكيك وَقد غَفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر قَالَ :أَفلا أَكون عبدا شكُورًا وَلم لَا أفعل وَقد أنزل عَلىّ هَذِه اللَّيْلَة (إِن فِى خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتِلَاف اللَّيْل وَالنَّهَار لَآيَات لأولِى الْأَلْبَاب) إِلَى قَوْله (سُبْحَانَكَ فقنا عَذَاب النَّار) ثمَّ قَالَ :ويل لمن قَرَأَهَا وَلم يتفكر فِيهَا

(দুররে মনসূর ২/৪০৯, আল-ইহসান [সহীহ ইবনে হিব্বান] ২/৩৮৭ হা. ৬২০, আবুশ শায়খ ইবনে হায়্যান [আখলাকুন নবী সা.] পৃ. ১৮৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. আমের ইবনে আবদে কায়স (রহ.) বলেন, আমি একজন নয়, দুজন নয়, তিনজন নয় বরং আরো অধিক সাহাবায়ে কেরাম হতে শুনেছি যে, ঈমানের রোশনি ও ঈমানের নূর হলো চিন্তা-ফিকির।

عن عامر بن عبد قيس قال :سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون :إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر

(দুররে মনসূর ২/৪০৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১৮৫, রূহুল মা'আনী ২/৩৭০)

হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ছাদের ওপর শুয়ে আসমান ও তারকাসমূহ দেখছিলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমাদের পয়দা করনেওয়ালা কেউ অবশ্যই আছেন, হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁর ওপর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পড়ল এবং তার মাগফিরাত হয়ে গেল।

عَن أَبى هُرَيْرَة مَرْفُوعا بَيْنَمَا رجل مستلق ينظر إِلَى السَّمَاء وَإِلَى النُّجُوم فَقَالَ :وَالله إِنِّى لأعْلم أَن لَك خَالِقًا وَربا اللَّهُمَّ اغْفِر لى فَنظر الله إِلَيْهِ فغفر لَهُ

(দুররে মনসূর ২/৪১০, রূহুল মাআনী ২/৩৭০

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঙ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা সারা রাত ইবাদত-বন্দেগী হতে উত্তম। হযরত আবুদ দারদা (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

عَن ابْن عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةٍ

(কিতাবুল আযমা [ইবনে হায়্যান] ১/২৯৭ হা. ৪২, বায়হাকী শু'আবুল ঈমান ১/১৩৬ হা. ১১৮, যুহুদ [ইমাম আহমদ রহ.] ১৭৯ হা. ৭৪৭]

হাদীসটির মান : সহীহ

চ. হযরত আনাস (রা.) হতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এক মুহূর্ত চিন্তা করা আশি বছর ইবাদত হতে উত্তম।

عَن أنس تفكر سَاعَة فِى اخْتِلَاف اللَّيْل وَالنَّهَار خير من عبَادَة ثَمَانِينَ سنة

(মুসনাদে দায়লামী ২/৭০ হা. ২৩৯৭, দুররে মনসূর ৪/১৮২, আত তাযকিরা [ফাতানী] ১৮৮)

ছ. উম্মে দারদা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হযরত আবু দারদা (রা.)-এর সর্বোত্তম ইবাদত কী ছিল? তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকির করা।

عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْد، قَالَ :سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، "مَا كَانَ أَفْضَلَ عَمَلِ أَبِى الدَّرْدَاءِ؟ فَقَالَت: التَّفَكُّرُ "

(আজমা [আবুশ শায়খ] ১/৩০২ হা. ৪৫, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২০৮, মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা ১/৩০৭ হা. ৩৫৭২৯, যুহুদ [আহমদ রহ.] ১৭৫ হা. ৭২১, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী রহ.] ১/১৩৬ হা.১১৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

জ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে এটিও বর্ণনা করা হয়েছে, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা ষাট বছরের ইবাদত হতে উত্তম।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

(কিতাবুল আজমাহ ১/২৯৯, হা. ৪৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

এর দীর্ঘ্য তাহকীক মাসিক আল-আবরার মে ২০১৫ দ্রষ্টব্য।

ঝ. মুসনাদে আবু ইয়ালা গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যিকরে খফী (গোপনে যিকির) যা ফেরেশতারাও শুনতে পান না তার সাওয়াব সত্তর গুণ। কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মখলুককে হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন এবং কিরামান কাতিবীন আমলনামা নিয়ে হাজির হবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অমুক বান্দার আমলসমূহ দেখো, কোনো কিছু বাকি আছে কি না? তারা আরজ করবে, আমরা সব কিছু লিখেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার নিকট তার এমন নেকী রয়েছে, যা তোমাদের জানা নেই। তা হলো যিকরে খফী।

-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يُفَضِّلُ الصَّلَاةَ الَّتِى يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِى لَا يَسْتَاكُ سَبْعِينَ ضِعْفًا .وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ الَّذِى لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا .فَيَقُولُ " :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ، وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا .قَالَ اللّٰهُ لَهُمْ :انْظُرُوا .هَلْ بَقِىَ لَهُ مِنْ شَىْءٍ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ .فَيَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ :إِنَّ لَكَ عِنْدِى خَبْئًا لَا تَعْلَمُهُ وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ "

(মুসনাদে আবী ইয়ালা ৪/৩৭৭ হা. ৪৭১৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮০, হা. ১৬৭৯৬)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঞ. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, যে যিকির ফেরেশতারাও শুনতে পান না, তা ওই যিকির হতে যা তারা শুনতে পান সত্তর গুণ বেশি ফযীলত রাখে।

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :الذِّكْرُ الَّذِى لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يَزِيدُ عَلَى الذِّكْرِ الَّذِى يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا

(শু'আবু ঈমান [বায়হাকী রহ.] ১/৪০৭ হা. ৫৫৫, জামেউস সগীর ২/৯০৩ হা. ৪৩৫২, মুসনাদে দায়লামী ২/২৪৯, হা. ৩১৭০)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ত. হযরত সা'আদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন, উত্তম যিকির হলো যিকরে খফী। আর উত্তম রিযিক হলো যা দ্বারা প্রয়োজন মেটে। হযরত উবাদা (রা.)ও রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِى

(মুসনাদে আহমদ ১/১৭২ হা. ১৪৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮১ হা. ১৬৭৯৫, ইবনে আবী শায়বা ১৭/২৪০ হা. ৩৫৫১৭, মুসনাদে আবী ইয়ালা ১/৩৪৫ হা. ৭২৭, ইহসান [সহীহে ইবনে হিব্বান] ৩/৯১ হা. ৮০৯, শু'আবুল ঈমান [বাহয়হাকী রহ.] ১/৪০৭ হা. ৫৫২)

হাদীসটির মান : হাসান লি শাওয়াহিদিহী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে সীমার মধ্যে না থাকা

এটি একটি ব্যাধি। এটি দুনিয়া এবং মালের মহব্বতের কারণে সৃষ্টি হয়। এরূপ ব্যক্তি হালাল-হারামের কোনো পার্থক্য করে না। অন্তর্চক্ষু খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে চর্মচক্ষুও সঠিক কাজ করে না। ঘুষ, ইনস্যুরেন্স, প্রাইজবন্ড, জুয়া এবং সমস্ত নাজায়েয সুদি কারবার থেকে বেঁচে থাকার চেতনা নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মালের মহব্বত এমন খারাপ জিনিস, যখন সেটা দিলের মধ্যে ঢুকে তখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও তাঁর স্মরণ আর দিলের মধ্যে থাকে না। কারণ এই ব্যক্তির তখন শুধু এটিই চিন্তা, কিভাবে পয়সা আসবে? অলংকার-কাপড় এমন হতে হবে। এত সম্পদ থাকতে হবে। ঘরবাড়ি এরূপ থাকতে হবে। জমি, প্লট আর ফ্ল্যাট থাকতে হবে। রাত-দিন তার ফিকির ও চিন্তা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগ কোথায়?

এর মধ্যে আরেকটি খারাবী এই, যখন মানুষের দিলের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত জমে যায়, তখন সেখান থেকে ফিরে আল্লাহর দিকে আসা তার নিকট কষ্ট মনে হয়। কারণ তখন তার মনে হয়, মৃত্যুর সাথে সাথেই সকল প্রাচুর্য শেষ হয়ে যাবে। আবার কখনো বিশেষভাবে মৃত্যুর সময় দুনিয়া ত্যাগ করতে কষ্ট লাগে। আর যখন সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন তখন (তাওবা, তাওবা, তাওবা) আল্লাহ তা'আলার সাথে তার দুশমনী হয়ে যায় এবং কুফরের উপর মৃত্যু হয়।

এর মধ্যে আরেকটি খারাবী হলো, যখন মানুষ দুনিয়া গোছানোর পিছে পড়ে তখন দাগাবাজি করতে সে সামান্য পরোয়া করে না বরং তার নিয়্যাত শুধু এটাই থাকে যে, যেখান থেকেই পয়সা আসুক পকেটে ভর। এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে, "দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত পাপের মূল।"

এটা যখন এতই খারাপ জিনিস, তবে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এ মুসীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। নিজের দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দেওয়া।

এর চিকিৎসা হলো–

১. বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং সব সময় এ চিন্তা করা যে, এই সব সামান একদিন ছাড়তেই হবে। অতএব এতে মন লাগানোর ফায়দা কী? বরং যত বেশি মন লাগবে ওই পরিমাণই ছাড়ার সময় আফসোস হবে।

২. সম্পর্ক বেশি বাড়াবে না। অর্থাৎ মানুষের সাথে মেলামেশা বেশি করবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান, জিনিস, বাড়ি, জমি ইত্যাদি জমা করবে না। কারবার, রোজগার, ব্যবসা সীমাতিরিক্ত প্রসারিত করবে না। এসব বিষয় প্রয়োজন ও আরাম পর্যন্ত রাখবে। মোট কথা, সামান অল্প রাখবে।

৩. অপচয় করবে না। কারণ অপচয় করলে আমদানির লোভ বাড়ে।

৪. মোটা খানা ও কাপড়ের অভ্যাস রাখবে।

৫. দরিদ্র মানুষের মধ্যে বেশি বসবে। ধনীদের সাথে মেলামেশা কম করবে। কারণ ধনীদের সাথে মেলামেশা করলে প্রত্যেক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়।

৬. যেসব বুযুর্গ দুনিয়া পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের কিচ্ছা ও ঘটনাবলি দেখবে।

৭. যে জিনিসের প্রতি বেশি আকর্ষণ হয় সেটাকে দান করে দেবে অথবা বিক্রি করে দেবে। ইনশাআল্লাহ তা'আলা এসব তদবীর দ্বারা দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে বের হয়ে যাবে। আর দিলের বিভিন্ন আশা যেমন– এত এত সামান ক্রয় করব। সন্তানদের জন্য এত এত বাড়ি ও জমি রেখে যাব। যখন দুনিয়ার মহব্বত দূর হয়ে যাবে, তখন এসব আশাও আপনাআপনি শেষ হয়ে যাবে।

গোস্বার সময় করণীয় :

গোস্বার সময় সীমার বাইরে চলে যাওয়া, আকল ঠিক না থাকা, পরিণাম চিন্তা করার মতো হুঁশ অবশিষ্ট না থাকার চিকিৎসা হলো সর্বপ্রথম যার ওপর গোস্বা হয় তাকে সাথে সাথে নিজের সামনে থেকে হটিয়ে দেওয়া, যদি সে না হটে তাহলে নিজেই ওই স্থান থেকে হটে যাওয়া।

অতঃপর চিন্তা করবে যে এ ব্যক্তি আমার সাথে যতটুকু অপরাধ করেছে, আমি তো সেটার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ আল্লাহ তা'আলার সাথে করেছি। আর যেমনিভাবে আমি চাই আল্লাহ তা'আলা আমার গুনাহ মাফ করে দিন, তেমনিভাবে আমারও উচিত তার অপরাধ মার্জনা করা।

মুখে اعوذ بالله পাঠ করবে আর পানি পান করবে অথবা ওজু করে নেবে। এতে গোস্বা ও রাগ চলে যাবে। এরপর যখন আকল সুস্থির হবে তখনও যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া সমীচীন মনে হয় এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন নিজের ছাত্র, সন্তান বা মুরিদ যার সংশোধন জরুরি। অথবা তাকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে অপরের কল্যাণ আছে। যেমন হয়তো সে কারো ওপর জুলুম করেছে এখন মজলুমকে সাহায্য করা এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া জরুরি এ জন্য শাস্তি দেওয়া জরুরি। এসব বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝে নেবে, কোন অন্যায়ের শাস্তি কতটুকু দেওয়া উচিত, ওই পরিমাণই শাস্তি দেবে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

শা'বান মাস আগমনের প্রাক্কালে মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

বেমালুম ভুলে যাওয়া ফজীলতপূর্ণ একটি মাস

মাহে রমাজানের বার্তাবাহক অগ্রদূত অসংখ্য ফজীলত ও বরকতময় মাস শা'বান আবারো আমাদের মাঝে এসে গেছে। এ মাসের করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিষয় জেনে রাখা সকলের জন্যই বাঞ্ছনীয়।

শা'বান আমার মাস :

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهرى، شعبان المطهر ورمضان المكفر

অর্থাৎ, শা'বান আমার মাস, রমাজান আল্লাহর মাস। শা'বান মানুষকে পবিত্র করে। আর রমাজান মানুষের গুনাহ মার্জনা করে। (ইবনে আসাকির ৭২/১৫৫)

শা'বানকে রাসূল (সা.)-এর মাস বলা হয়েছে। কারণ এ মাসে রোযা ও বিভিন্ন ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আর রমাজানকে আল্লাহর মাস বলার কারণ রোযা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। যেমন– হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قلت يارسول الله لم ارك تصوم شهرا من الشهور ماتصوم من شعبان ، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملى وانا صائم

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শা'বানে যে পরিমাণ রোযা রাখেন অন্য কোনো মাসে আপনাকে এত বেশি রোযা রাখতে দেখি না? রাসূল (সা.) বলেন, এটা এমন একটি মাস, যে মাসের ফজীলত মানুষ রজব ও রমাজানের কারণে ভুলে যায়! এ মাসে মানুষের আমল রাব্বুল আলামীনের কাছে পেশ করা হয়। তাই আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক এটা পছন্দ করি। (নাসাঈ)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত–

لم يكن النبى ﷺ يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله

রাসূল (সা.) শা'বান মাসের চেয়ে বেশি নফল রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি (প্রায়) পুরো শা'বান মাসেই রোযা রাখতেন। (বুখারী-১৯৭০)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, كان يصوم شعبان الا قليلا 'তিনি কয়েক দিন ছাড়া পুরো শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।' (মুসলিম-১১৫৬)

আমল পেশ করার স্তর :

ওপরে হযরত ওসামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শা'বান মাসে বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমল পেশ করার স্তর তিন ভাগে বিভক্ত।

১. দৈনিক। এটা প্রতিদিন ফজর ও আসরের নামাযের সময় হয়। এটা প্রতীয়মান হয়, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদীস থেকে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون : تركنا هم وهم يصلون واتينا هم وهم يصلون-

তোমাদের মাঝে দিনে ও রাতে পালাক্রমে ফেরেশতারা আগমন করেন, ফজর ও আসরের নামাযে তাঁদের সম্মিলন হয়। তোমাদের মাঝে যাঁরা রাত্রি যাপন করেন তাঁরা আসমানে উঠে যান, তখন তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, (অথচ তিনি বান্দাদের ব্যাপারে বেশি অবগত) তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, তাদের থেকে বিদায়কালেও তারা নামাযরত আর তাদের কাছে আগমনের সময়ও তাদেরকে নামাযরত পেয়েছি। (বুখারী, মুসলিম)

২. সাপ্তাহিক, এটা জুমু'আর রাতে করা হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি–

ان اعمال بنى آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم

আদম সন্তানের আমলনামা প্রত্যেক জুমু'আর রাতে পেশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল করেন না। (মুসনাদে আহমদ)

৩. বার্ষিক। এটা শা'বান মাসে হয়। হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট বুঝে আসে। তাই তো রাসূল (সা.) রোযাবস্থায় নিজের আমল পেশ হওয়াকে পছন্দ করতেন এবং শা'বানজুড়েই রোযা রাখতেন।

শা'বান রমাজানের বার্তাবাহক :

শা'বান যেহেতু মাহে রমাজানের বার্তাবাহক, তাই পবিত্র রমাজানে যেসব আমল অনুমোদিত শা'বানেও সেসব আ'মাল করণীয়। তারাবীহ ছাড়া। যেমন– রোযা রাখা, তেলাওয়াত করা, এর দ্বারা মাহে রমাজানের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হবে। আবার প্রবৃত্তিও আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অনুরাগী হবে। আসলাফও এই মাসে ইবাদত তেলাওয়াতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমন– সালামা বিন কুহাইল বলেন–

كان يقال: شهر شعبان شهر القراء

শা'বান মাস তেলাওয়াতের মাস। শা'বান মাস আসলে হাবীব বিন আবী ছাবেত বলতেন–

هذا شهر القراء 'এটা তেলাওয়াতকারীদের মাস।'

كان عمرو بن قيس الملائى اذا دخل شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن

আর আমর বিন কায়েছ তো শা'বান মাস এলে নিজের বিপণনকেন্দ্র বন্ধ করে তেলাওয়াতে লেগে যেতেন।

নিসফে শা'বান :

এ মাসে বিশেষ ফজীলতপূর্ণ একটি রাত রয়েছে, যাকে সবাই 'শবে বরাত' নামে অবহিত করে থাকে। এই রাতের ফজীলতের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفرله الا مسترزق فارزقه، الا مبتلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔

তোমরা শা'বানের ১৫ তারিখের রাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও আর দিনের বেলা রোযা রাখো, কারণ আল্লাহ তা'আলা সে রাতে সূর্যাস্তের সময় দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন, কেউ আছে কি ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কেউ আছে কি রিযিকপ্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দান করব। বিপদগ্রস্ত কেউ আছে? আমি তার বিপদ দূর করে দেব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ হা. ১৩৮৮)

উপরোল্লিখিত হাদীসে শবে বরাতের রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকা এবং নিজের জরুরত আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে বলা হয়েছে। এসব কিছুই নফলের অন্তর্ভুক্ত। নফল ইবাদত একাকী যথাসম্ভব নির্জনে গোপনে করা উত্তম। অনুষ্ঠান করার নাম ইবাদত নয়। রাত জেগে ফজরের নামায কাযা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। হালুয়া-মিষ্টি বিতরণ করা বা সংগ্রহ করার জন্য মসজিদে গমন করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। পবিত্র এই রাতটিকে রকমারি বিদ'আত ও রসম পালন করার মাধ্যমে কলুষিত করা প্রকৃত মু'মিনের কাজ নয়। আর শবে বরাতের অস্তিত্বের অস্বীকার ও মুসলিম জনসাধারণকে এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করতে বারণ করা বা নিরুৎসাহিত করা নির্বোধ ও মূর্খদের পক্ষেই সম্ভব।

গ্রন্থনা

মুফতী নুর মুহাম্মদ

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন :
০২-৯১১৩৮৫১

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

টিভি প্রোগ্রামে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানগণ বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার। বাতিল শক্তি এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছে এর মধ্যে টিভি চ্যানেলগুলো অন্যতম। এই চ্যানেলগুলোতে ইসলামের নামে এমন বিকৃত বিষয় ফেরি করা হয়ে থাকে, যেগুলো মুসলিমদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করছে। মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করছে। সালাফে সালেহীনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করাসহ বিকৃত ইসলাম উপস্থাপনের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্মতার সাথে মানুষকে মূল ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিস্থিতির এই নাজুকতার প্রতি হামদর্দ হয়ে উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ টিভিতে প্রোগ্রাম করা সময়ের দাবি বলে মনে করছে। কিছু কিছু আলেম তো হক্কানী উলামাদের জন্য টিভিতে প্রোগ্রাম বৈধ হওয়ার ফাতওয়া পর্যন্ত দিয়েছেন। জনসাধারণের একদল দ্বীনদার শ্রেণী দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার কারণে উলামায়ে কেরামকে টিভিতে আসার আহবান করছে এবং চ্যানেলগুলো ব্যবহার করে ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উল্লিখিত শ্রেণীর আন্তরিক এই দাবি শরয়ী দৃষ্টিকোণে যাচাই করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

টিভিতে প্রোগ্রামের বৈধতা প্রসঙ্গ :

টিভি চ্যানেল ব্যবহার করে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উলামায়ে কেরামের জন্য টিভিতে প্রোগ্রাম করা আমাদের মতে জায়েয নেই। এ কথা ঠিক যে, দাওয়াতী কার্যক্রম ইসলামে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পরিচালনার জন্য গুনাহের পথ অবলম্বন করা হয়েছে এর কোনো দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাইনি। আর টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রাম যে অসংখ্য গুনাহের সমষ্টি, তা চোখ খোলা ব্যক্তি মাত্রই অবগত। আমরা এখানে গুনাহের কয়েকটি দিক তুলে ধরছি।

টিভি প্রোগ্রামে কয়েকটি বড় গুনাহ :

এক. টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি তোলার গুনাহে লিপ্ত হতে হয়। কারণ টিভি-ক্যামেরায় যে ছবি ধারণ করা হয় নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা শরীয়তের দৃষ্টিতে তাসবীর। বিশেষত ছবি হারাম হওয়ার যে ঐতিহাসিক দিকগুলো রয়েছে, মানুষ একপর্যায়ে শ্রদ্ধার আতিশয্যে ছবিকে পূজনীয় বস্তুতে পরিণত করে, তা এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। আজকাল তো পূজার স্থলে প্রজেক্টরও ব্যবহার করা হয় এবং ছবি পূজারীরা ভাসমান ছবিকে স্থির ছবির মতো পূজনীয় মনে করে। এত কিছুর পরও এটাকে ছবি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

দুই. আমরা যদি টিভির শুধু ইসলামী প্রোগ্রামের প্রতি দৃষ্টি দিই, সে ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের কারণে একজন দর্শকের বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। যেই ইসলামের জন্য বেগানা সুন্দরী নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়, সেই ইসলামী প্রোগ্রাম কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর বিজ্ঞাপন ছাড়া যে টিভি চ্যানেল পরিচালনা সম্ভব নয় নিকট অতীতের 'ইসলামী টিভি' এর জ্বলন্ত সাক্ষী। প্রথমে তারা বিজ্ঞাপনমুক্ত থাকার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল; কিন্তু একসময় তারা এ নীতির ওপর টিকে থাকতে পারেনি।

তিন. টিভি প্রোগ্রামের দর্শক নারী-পুরুষ সকলেই। নারীদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হারাম না; কিন্তু কোনো কোনো অবস্থা এমনও আছে, যখন পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম হয়ে যায়। তাহলে যে প্রোগ্রামের দর্শকগণ গুনাহমুক্তভাবে প্রোগ্রামকে উপভোগ করতে অক্ষম, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন প্রোগ্রাম করার স্বার্থকতা কী? এটা কি গুনাহের কাজে সহযোগিতা নয়?

উলামাদের টিভিতে প্রোগ্রাম, ঘরে ঘরে টিভি রাখার আহ্বান

টিভিতে উলামায়ে কেরামের প্রোগ্রাম যদি বৈধ হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে টিভি রাখাও বৈধ হবে। কারণ, সাধারণ মানুষকে উলামায়ে কেরাম থেকে দ্বীন শিখতে বলা হয়েছে। এখন উলামায়ে কেরাম যেহেতু টিভির মাধ্যমে দ্বীন শেখাতে চাচ্ছেন, তাহলে সাধারণের জন্য টিভি ক্রয় করা দোষের কী? বরং সে ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কেরাম, মুফতী, মুহাদ্দিস– সকলের জন্য ঘরে, মাদরাসায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিভি রাখাও বৈধ হয়ে যাবে। টিভিতে যখন প্রোগ্রাম করা জায়েয, তখন দেখা জায়েয হবে না কেন?

আমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছি যে, টিভিতে প্রোগ্রাম করাকে বৈধ বলার পরিণতি কী দাঁড়াবে? দ্বীনের এমন অবুঝ দরদের পরিণতিতে দ্বীনের কত ক্ষতি হবে! বিরোধী শক্তি চ্যানেলগুলোতে

ইসলামের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালিয়ে যতটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হচ্ছে, উলামায়ে কেরামের জন্য টিভিতে প্রোগ্রাম যদি বৈধ করা হয় তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ক্ষতি হবে। আর শরীয়তস্বীকৃত নীতি হলো–

يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام

'সীমিত ক্ষতিকে মেনে নেওয়া হবে ব্যাপক ক্ষতি থেকে বাঁচার স্বার্থে।'

(আল-আশবাহ : ১/২৫৬)

সুতরাং এ মূলনীতির ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, উলামায়ে কেরামের জন্য টিভিতে প্রোগ্রাম করা বৈধ নয়।

টিভিতে ইসলামী প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত নয়, বরং দীনকে দাফন করা হয় :

টিভি চ্যানেলগুলো আবিষ্কারসূত্রে বিনোদন হলো এর মূল লক্ষ্য। বিনোদনের জন্যই মূলত টিভি চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে; ইসলাম প্রচারের জন্য নয়। আর বর্তমানের বাস্তব অবস্থা দেখলেও এ বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকবে না যে, টিভি চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টাই হলো সব ধরনের হারাম এবং নাজায়েয প্রোগ্রামের শিডিউল। এর মধ্যে ১৫ মিনিট বা আধা ঘণ্টা ইসলামী প্রোগ্রাম রাখা গান্দা ড্রেন দিয়ে ভেসে আসা রসগোল্লার মতো। রসগোল্লা তো মজাদার জিনিস বটে; কিন্তু নর্দমার রসগোল্লা কি কেউ খাবে? সুতরাং এ প্রোগ্রাম ইসলাম নিয়ে এক ধরনের রং-তামাশা নয় কি? এটা তো হলো

সিনেমা, নাটক, সিরিয়াল চলাকালে নামাযের ওয়াক্ত হলে আমাদের দেশের আযান প্রচারের মতো। এই সময়টা সকলে টয়লেট সারতে যায়। যেন জরুরত থেকে ফারেগ হওয়ার জন্য সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাঝে বিরতি দেওয়া হলো। এমন ইসলামী প্রোগ্রামে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। ইসলাম নিয়ে তামাশা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লামা ইবনে নুজাইম লেখেন,

وكذا الحارس اذا قال فى الحراسة :لا اله الا الله يعنى لاجل الاعلام بانه يستيقظ.

অর্থাৎ পাহারাদার যদি নিজের জাগ্রত থাকার অবস্থা প্রকাশার্থে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সেটাও নিষিদ্ধ। কারণ এটাও ইসলামের কালিমার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা।

জনগণ সঠিক এবং ভুল নির্ণয়ে ব্যর্থ হবে

যেহেতু হক্কানী উলামাগণ এখনও টিভি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি, তাই জনগণ নির্দ্বিধায় কাদের কথা সঠিক আর কাদেরটা ভুল নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছে। টিভিতে লেবাসধারী উলামাগণ যে ফাতওয়া-মাসাইল দিয়ে থাকেন জনসাধারণ তা সঠিক বলে বিশ্বাস করে না। এমনকি ওই আলেমকেও হক্কানী আলেম বলে মানে না বরং তাদেরকে পথভ্রষ্ট দুনিয়াদারী আলেম মনে করে এবং তাদেরকে ঘৃণার নজরে দেখে। কিন্তু যদি কোনো সময় এমন হয় যে, হক্কানী উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ প্ররোচিত হয়ে টিভি চ্যানেলে অংশগ্রহণ করছেন, তখন টিভিতে প্রচারিত কোন কথা সঠিক আর কোন কথা ভুল, জনগণ তা নির্ণয় করতে পারবে না। ফলে সাধারণের বিভ্রান্তির কোনো সীমা থাকবে না। এ ক্ষেত্রে বেশি আশঙ্কা তো এটাই হয় যে, মানুষ ভুলটাকে সঠিক মনে করবে। কারণ বাতিলের প্রচার সব সময় বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়। তাছাড়া তাদের প্রচার-পদ্ধতিও সাধারণত শক্তিশালী হয়ে থাকে। এতে জনসাধারণ তালগোল পাকিয়ে ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং গোমরাহীর গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

সঠিক ইসলাম প্রচার বাতিল কখনো সহ্য করবে না :

বাতিল কখনো সঠিক ইসলাম প্রচার মেনে নেবে না। আমাদের এই ৯০% মুসলিম দেশে সত্য প্রচারের কারণে কত প্রচারমাধ্যম বন্ধ হয়েছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আজকের বিশ্বে মুসলিমদের পক্ষাবলম্বী কোনো মিডিয়াযন্ত্রকে ইহুদী লবী মেনে নেয়নি। যখনই কোনো মিডিয়া ইসলামের পক্ষে কথা বলেছে কুফুরী শক্তি সে মাধ্যম ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম কোন নির্ভরতার ভিত্তিতে টিভিকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। উলামায়ে কেরাম যদি টিভিতে যায় তাহলে অবশ্যই বাতিলপন্থীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তাদের হাতে নিজেকে বিক্রি করে দিতে হবে। না হয় তার আকাশচুম্বী স্বপ্ন ধুলোয় মিশে যাবে।

টিভি চ্যানেল মানুষকে গুনাহে অভ্যস্ত করে তুলছে :

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যায়-অপকর্মপ্রবণ। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো মহান নবীর উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

অর্থ : আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না; নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয় আমার পালনকর্তা, যার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

এ কারণে কখনো কোনো চ্যানেলে যদি ভালো কিছু প্রচারিত হয় তাহলে সিংহভাগ মানুষ সে চ্যানেল পরিবর্তন করে এমন চ্যানেল চালু করবে, যেখানে নাচ-গান, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য মহড়া চলছে। মানুষের এই মন্দ প্রবণতার দিক অস্বীকার করার কোনো

সুযোগ নেই। আর ইসলামী আলোচনা শুনতে মানুষ কতটা যে আগ্রহী সপ্তাহে একদিন জুমু'আর বয়ানের সময় মসজিদগুলোর মুসল্লিশূন্য চিত্রই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। বয়ানের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কিছু বৃদ্ধ মুসল্লি ছাড়া উল্লেখযোগ্য যুবক শ্রোতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার কখনো বয়ান শেষ করতে সামান্য দেরি হলেই খতীবের খেতাবাত 'নট' হওয়ার উপক্রম হয়। তাহলে হাজারো নগ্ন, অশ্লীল, দিলকাশ, রগরগে প্রচারণার মাঝে আলেম সাহেবের নসীহত শোনার জন্য শ্রোতা পাওয়ার আশা করা যায় কিভাবে?

ডা. জাকির নায়েক এবং উম্মতের অবিচ্ছিন্ন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের মেলাবেন না। কারণ মানুষ এদের লেকচার শুনে উলামায়ে কেরামের সাথে ঝগড়া করার জন্য; দ্বীন শেখার জন্য নয়। এ কারণে এদের আলোচনার প্রভাব এই হয় যে, পুরুষরা তো মসজিদে নামায পড়তে যায় না;

কিন্তু নারীরা আবেদনময়ী পোশাক পরে দিব্যি মসজিদে যাতায়াত শুরু করে দেয়।

টিভি চ্যানেল ইসলামী তাহযীব তামা-দ্দুন বিলুপ্তির মাধ্যম :

টিভি চ্যানেলগুলো পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির ফেরিওয়ালা। পশ্চিমারা যেভাবে নগ্নতা ও অশ্লীলতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তারা চায় সারা বিশ্বের মানুষ বিশেষত মুসলিমগণ তাদের এই অপসংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যাক এবং তাদের মতো মুসলিমদেরও পরিবার কাঠামো বিলুপ্ত হয়ে যাক। পারস্পরিক সৌহার্দ্য-ভালোবাসার পরিবর্তে মুসলিমরা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় দীক্ষা লাভ করুক। তাদের এ মনোবাসনার কথা আল কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

অর্থ : তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির তোমরাও তেমন কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যাও। (সূরা নিসা : ৮৯)

উলামায়ে কেরাম কি টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম করে পশ্চিমাদের এ মিশনকে শতভাগ সফল করতে সহযোগিতা করতে চায়? তারা ঘরে ঘরে টিভি ঢুকিয়ে এই অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে মানুষকে কিভাবে বাঁচাবে? তাদের এক্কা-দোক্কা ইসলামী প্রোগ্রাম কি পালে হাওয়া পাবে? ইসলামের স্বীকৃত নীতি হলো গুনাহ এবং গুনাহের মাধ্যম উভয়টাকেই বন্ধ করা। (দেখুন : আল-মুআফাকাত : ২/৫৩৬)

সন্দেহপূর্ণ বিষয় ইসলাম পরিত্যাগ করতে বলে :

আলেমদের কেউ কেউ এই অজুহাতে টিভিতে প্রোগ্রাম বৈধ বলতে চায় যে, ডিজিটাল ছবি কোনো কোনো আলেমের মতে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের এ দাবি যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নিই এবং নাজায়েয হওয়ার অন্যান্য সকল কারণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তার পরও শরীয়তের চাহিদা হলো টিভিতে প্রোগ্রাম না করা। কারণ ডিজিটাল ছবি তাসবীর কি না, এ বিষয়টি যেহেতু একটি মতবিরোধপূর্ণ বিষয় (নির্ভরযোগ্য মত কোনটি তা গত সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে) তাই এ মাসআলাটি মুশতাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) মুশতাবিহাতের প্রকারের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

ثانيها :اختلاف العلماء

মুশতাবিহাতের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যে বিষয় বৈধ-অবৈধ, জায়েয-নাজায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে।' (ফাতহুল বারী : ১/১৭০)

আর মুশতাবিহাতের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) মতান্তরে ইমাম শা'বী বলেন,

ما اجتمع الحرام والحلال الا غلب الحرام على الحلال

হারাম-হালাল একত্রিত হলে হারাম হালালের ওপর প্রাধান্য পায়।' (বাইহাকী সুনানে কুবরা হা. নং-১৩৯৬৯)

শরীয়তে স্বীকৃত নীতি হলো, 'যখন আদেশ-নিষেধের মধ্যে বিরোধ হয়ে যায় তখন নিষেধাজ্ঞা প্রাধান্য পায়...? তাছাড়া নবীজি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুবুহাতে (হালাল-হারামের মাঝে সংশয়পূর্ণ বিষয়) পতিত হলো সে হারামে পতিত হলো।' (বুখারী হা. নং-৫২, মুসলিম হা. নং-১৫৯৯)

উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের মৌলিক দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

এক. যখন কেউ সংশয়পূর্ণ বিষয় পালনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকবে না তো একপর্যায়ে সুনিশ্চিত হারাম বিষয়ে পতিত হতে তার অন্তর বাদ সাধবে না।

উলামায়ে কেরামের টিভি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ উলামা শ্রেণী ও জনসাধারণদের মধ্যে এই প্রভাব ফেলবে যে, যারা টিভি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, টিভিকে তখন তারা হালাল মনে করে দেখবে। যারা একসময় কালেভদ্রে হারাম প্রোগ্রাম দেখত, তখন তারা নির্দ্বিধায় তা দেখতে থাকবে। আর যারা টিভি দেখতই না তারাও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হবে এবং নোংরা প্রোগ্রাম দেখা তাদের নিকট কোনো গুনাহ বা অন্যায় মনে হবে না।

দুই. যেহেতু হালাল কিংবা হারাম হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়, তাই হতে পারে বাস্তবে সংশয়পূর্ণ বিষয়টি হারাম ছিল। সুতরাং সংশয়পূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তি যেন স্পষ্ট হারাম কাজটি করল।

(ইহকামুল আহকাম : ৪/১৮৩, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম : ৮৫ পৃ. ফাতহুল বারী : ৪/৩৬৭)

টিভি চ্যানেলের ধ্বংসাত্মক প্রভাব :

টিভি চ্যানেলের ভয়াবহতা নিয়ে রক্ষণশীল সাধারণ সমাজও চিন্তাগ্রস্ত। এ ব্যাপারে ২০১৪ ইং সালের একাধিক দৈনিকের একাধিক কলামে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'এসব চ্যানেল আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিলুপ্ত করে ছাড়বে।' অথচ কতক উলামায়ে কেরাম এসব চ্যানেলের মাধ্যমে পুরো দেশে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টির বৃথা স্বপ্ন দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক চিন্তাশক্তি দান করুন।

যাঁরা ডিজিটাল ছবি জায়েয মনে করেন, তাঁরা টিভির প্রোগ্রাম নাজায়েয বলেন :

এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম করাচির ১৪২৭ হিজরীর একটি ফাতওয়ার সারাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

জিজ্ঞাসা : আজকাল টিভিতে প্রোগ্রাম করতে যেসব উলামায়ে কেরাম আসেন তাঁদের টিভিতে প্রোগ্রাম করতে আসার কী হুকুম এবং তাঁদের প্রোগ্রাম দেখার কী হুকুম?

জবাব : ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

যেমন–টিভি ইত্যাদি সম্পর্কে এতটুকু কথা তো স্পষ্ট যে, বর্তমান সময়ে টিভিতে যেসব প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় তাতে নগ্নতা, অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ফেরি করা হয় আর টিভিতে এমন কোনো প্রোগ্রাম পাওয়া দুষ্কর বিষয়, যাতে কোনো না কোনো শরীয়তগর্হিত কাজ হয় না। তা ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি টিভি ঘরে রাখে তাহলে তার জন্য নোংরা ও অশ্লীল প্রোগ্রাম দেখা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব প্রায়। তাই টিভি ঘরে না রাখা চাই। (ডিজিটাল তাছবীর আওর সিডিকে শরয়ী আহকাম, পৃ. ১৬১)

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.) বলেন, 'টিভি খুবই ধ্বংসাত্মক একটি যন্ত্র। এর ক্ষতির দিকটা সুদূর বিস্তৃত। আরব-অনারবে টিভি সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে আকীদা, আখলাক ও সমাজের ওপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে... (ফাতওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ৪২৩)

নববী পদ্ধতিতে দাওয়াতী কাজ করুন :

একসময় একজন আলেমই বিশাল পরিধির জন্য যথেষ্ট হতেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন মহান ব্যক্তি অনেক পাওয়া যাবে, যাঁদের একজনের মেহনতে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এর কারণ ছিল সেই মহান ব্যক্তিদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং রাব্বের কায়েনাত-মহান আল্লাহর সাথে এমন গভীর সম্পর্ক যে, তাঁদের পবিত্র আত্মার ছোঁয়া অন্য আত্মায় পৌঁছে যেত। ফলে বাতিলের কোনো অপপ্রচার সমাজে টিকত না। বর্তমান পরিস্থিতিতেও যদি উলামায়ে কেরাম নিজেদের সংশোধনের মাধ্যমে বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থানে পৌঁছতে পারেন, তাহলে টিভিতে প্রোগ্রাম করা ছাড়াই গোটা সমাজকে ইসলামীকরণ সম্ভব হবে। অন্যথায় টিভি চ্যানেলে গিয়ে দ্বীন প্রচারের হাজারো চেষ্টা-তদবীর বাতিলের অপপ্রচারের স্রোতে ভেসে যাবে। আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. বর্তমান সময়ের চেষ্টা-তদবীর বিফল হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'যদি ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার আখলাক-চরিত্র, সীরাত-সূরত ঠিক করে ভালো মানুষে পরিণত না হয়ে-ই অন্যদের সংশোধনের ফিকির করি, তাহলে আমার কথায় কোনো প্রভাব থাকবে না।' (ইসলাহী খুতুবাত : ৬/২০৮)

এ ছাড়া বৈধ পন্থায় ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে যতটুকু দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুনাহে লিপ্ত হয়ে কিংবা নিজের পরকালকে বরবাদ করে অন্যের উপকার করার ঠিকাদারি উলামায়ে কেরামকে দেওয়া হয়নি।

গুনাহের সাথে দ্বীনি কাজের ফলাফল শূন্য :

উলামায়ে কেরাম গুনাহের সাথে যুক্ত থেকে অন্যকে গুনাহমুক্ত জীবনযাপনের আহবান করলে এর ভালো কোনো প্রতিক্রিয়া জনগণের ওপর পড়বে না। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন বলো এমন কথা, যা তোমরা করো না।' (সূরা ছফ : ২)

টিভি প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। তাহলে নিজে গুনাহ থেকে বিরত না থেকে অন্যকে আহ্বান করা হলো না! আল্লামা ইউসুফ লুদিয়ানভী (রহ.) বলেন, 'টিভির ভিত্তিই হলো ছবির ওপর। আর ছবি লানতের কাজ হওয়া সব মুসলিমেরই জানা। আর কোনো লানতের জিনিসকে নেক কাজের মাধ্যম বানানো দুরস্ত নয়, যেমন শরাবকে উষুর মাধ্যম বানানো যায় না।' (আপকে মাসাইল : ৭/৩৯১)

সর্বশেষ হযরত তকী উসমানী (দা.বা.)-এর একটি উক্তি তুলে ধরছি, প্রত্যেক আলেমের জন্য বাক্যগুলো বারবার পড়া এবং অন্তর দিয়ে অনুধাবন করা উচিত। হযরত কোনো এক প্রসঙ্গে বলেন, 'আজ আমাদের সব প্রচেষ্টা বেকার এবং বে-আছর হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, আমরা গুনাহের সাথে তাবলীগ করতে চাই, গুনাহ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।' (ইসলাহী খুতুবাত : ৩/১৪৭)

মাহে রমাজান ও রোযা
তাৎপর্য ফজীলত মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

চাঁদের ১২ মাসের মধ্যে নবম মাস মাহে রমাজান। রমাজান শব্দটি আরবী রামাজুন থেকে নির্গত। উলামায়ে কেরাম এর অনেক অর্থ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অর্থ হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। সে হিসেবে এ মাসের নাম রমাজান রাখা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহমত দ্বারা বান্দার গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে দেন এবং মানুষের মধ্যে ভালো কাজের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করেন। আবার অনেকে বলেন, রমাজান শব্দের অর্থ কষ্ট সহ্য করা ও উত্তপ্ত হওয়া। এই মাসে যেহেতু সাবালক মুসলিম নর-নারী শরয়ী উযর ব্যতীত স্বাভাবিক রোযা রাখার মাধ্যমে ক্ষুধা, পিপাসা ও মানবীয় চাহিদার কষ্ট সহ্য করে, তাই এ মাসকে রমাজান মাস বলা হয়।

রমাজান মাসের রোযা মুসলমানদের ওপর কবে ফরজ করা হয়?

হিজরতের দ্বিতীয় বছর শা'বান মাসের ১০ তারিখে আল্লাহ তা'আলা রমাজানের রোযা মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ করেন। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই ঐশী বাণী নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাশরীফ আনেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যাতে করে তোমরা মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সংযমী হতে পারো।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

পবিত্র হাদীসে এসেছে–

"রমাজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা আশুরার রোযা এবং আইয়ামে বীজ তথা চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা রাখতেন।

পবিত্র রমাজানের ফজীলত :

মহান রাব্বুল আলামীন এই পবিত্র মাসকে নিজের মাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন– হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'রমাজান মহান আল্লাহ তা'আলার মাস।' (বুখারী ২/৫৮৪, হা : নং ১৮৯৪)

যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই মাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদ্দরুন এই মাস বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই মাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক থাকার অর্থ হলো এই মাসের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাজাল্লী এত বেশি নাযিল হয়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন– "রমাজান এমন মাস, যার প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়, যার ফলে মানুষের জন্য গুনাহের গভীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এই মোবারক মাসের মধ্যাংশে পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং শেষাংশে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক স্থায়ী আযাব হতে রেহাই হয়।" (মীযানুল ই'তিদাল ২/৯৭, হা : নং ৩৩৪৬)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

"রমাজান মাসের প্রথম রজনীতে শয়তানদেরকে মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হয় এবং অবাধ্য জিনদেরও বন্দি করে রাখা হয়। দোযখের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো দরজা পুরো রমাজান মাসে খোলা হয় না এবং জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয়। একটা দরজাও বন্ধ করা হয় না। সাথে সাথে একজন আহ্বানকারী আহবান করতে থাকেন, হে সাওয়াবপ্রত্যাশীরা অগ্রসর হও, সাওয়াবের মোক্ষম সময়। হে পাপিষ্ঠরা পাপ থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং নিজেদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখো। কেননা, এই পবিত্র সময়টা তাওবা করার এবং গুনাহমুক্ত হওয়ার সময়। এই পবিত্র মাস কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য। আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র মাসের সম্মানার্থে অনেক পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আর তা রমাজানের প্রতি রাত্রে। (বায়হাকী শু'আবুল ঈমান ৩/৩০১, হা: নং ৩৫৯৭-৯৮)

রোযা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং কিয়ামত দিবসে মহান রাব্বুল আলামীন কোনো মাধ্যম ছাড়াই এর প্রতিদান স্বয়ং নিজেই রোযাদারদেরকে দান করবেন। যেমনটা হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "রোযা আমারই জন্য রাখা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।" (সুনানে বায়হাকী ৪/৩০৩, হা : নং ৮৫০০)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ

তা'আলার নিকট মিশকে আম্বরের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়।" [বুখারী ২/৫৮৪-(১৮৯৪)]

মোট কথা, রোযাদার যেমন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়, সেরূপ তার মুখের ঘ্রাণও আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাজানের জন্যই সজ্জিত করা হয় এবং উন্নতমানের সুগন্ধি দ্বারা ধোঁয়া দেওয়া হয়। রমাজান মাসের প্রথম তারিখ থেকে আল্লাহ তা'আলার আরশে আজীমের নিচ থেকে বিশেষ ধরনের এক বাতাস বয়ে আসে, যার নাম "মশীরা"। যার দোলনায় জান্নাতের গাছের পাতা এবং দরজার কড়া এমনভাবে দোলে, যা থেকে মনমাতানো এক প্রকারের সুর-লহরি সৃষ্টি হয়। যে রকম আওয়াজ শ্রবণকারীরা এর পূর্বে আর কখনও শোনেনি। তখন জান্নাতের হুরেরা আপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে জান্নাতের সুউচ্চ দালানে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়। কেউ কি আল্লাহর দরবারে আমাদের সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হতে চায় এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে আমাদের জোড়া বানিয়ে দেবে। এরপর তারা, অর্থাৎ জান্নাতের হুরেরা জান্নাতের দায়িত্বরত ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, এ রাতটা এত অদ্ভুত কেন? ফেরেশতারা লাববাইক বলে উত্তর দেবেন। হে পরম সুন্দরী! উত্তম চরিত্রের অধিকারী মহিলারা! এই রাত হলো রমাজান মাসের প্রথম রাত এবং মহান আল্লাহ জান্নাতের প্রধান অফিসার, অর্থাৎ রিজওয়ানকে সম্বোধন করে বলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদের জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দাও এবং জাহান্নামের প্রধান অফিসার "মালেক"কে সম্বোধন করে বলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদের জন্য জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে দাও। হযরত জিবরাঈল (আ.) কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, জমিনে গিয়ে অবাধ্য শয়তানগুলোকে বন্দি করে নাও এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। যাতে আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদেরকে পথভ্রষ্ট ও ক্ষতি করতে না পারে। (বায়হাকী ৩/৩১২-৩৬৩৩, ৩৬৩৪)

পবিত্র রমাজান মাসের সাথে মহাগ্রন্থ কোরআনে করীম ও অপরাপর আসমানী কিতাবসমূহের সম্পর্ক :

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যে চারটি বড় আসমানী কিতাব নাযিল করেছিলেন, এর সব কয়টি মাহে রমাজানে নাযিল করেছেন। তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনে করীম রমাজান মাসেই অবতীর্ণ করেছেন। এ মাসেই পবিত্র কোরআনে করীমকে লাওহে মাহফুজ থেকে নিচের আসমানে নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"রমাজান মাস, যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "হযরত জিবরাঈল (আ.) রমাজানের প্রতি রাতে আগমন করতেন এবং কোরআন শরীফ দাওর করতেন।" (বুখারী ২/৫৮৬-১৯০২)

রোযার মতো আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই মাসকেই নির্ধারিত করেছেন। রমাজান মাসের ফজীলতের চেয়ে আর কী হতে পারে?

এ মাসে ওমরাহর ফজীলত :

এ মাসে একটি ওমরাহ করলে একটি হজ আদায়ের সাওয়াব হয় এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সাথে হজ আদায়ের মর্যাদা রাখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ؟، قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন উম্মে সিনান নামক এক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে হজ করা থেকে নিষেধ করল? প্রতি উত্তরে মহিলা বলল, উমুকের পিতা (তথা তার স্বামী)। তার দুটি পানি সেচের উট রয়েছে। একটির ওপর সাওয়ার হয়ে তিনি হজ করেছেন অপরটা দ্বারা জমিতে পানি সেচা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, রমাজান মাসে ওমরাহ করা আমার সাথে হজ আদায় করার সমতুল্য। (বুখারী শরীফ, হা. ১৮৬৩)

অন্যত্র বর্ণিত আছে–

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন আনসারী মহিলাকে বললেন, যখন রমাজান মাস আসে তখন তুমি ওমরাহ করো। কেননা, রমাজান মাসের ওমরাহ হজের মর্যাদা রাখে। (সুনানে নাসাঈ, হা. ৪৩৬)

একজন মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করল–

مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

অর্থ : কোন ইবাদতে আপনার সাথী হয়ে হজ করার সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়? তিনি উত্তর দিলেন, রমাজান মাসে ওমরাহ করা। (সুনানে আবু দাউদ, হা. ১৯৯০)

রমাজান মাসের উল্লিখিত ফজীলত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মুসলমানগণের উচিত এই মাসে ইবাদতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সময় অপচয় না করা। রাত-দিন সর্বদা ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকা।

অন্য মাসের স্থায়ী ইবাদতের সাথে বিশেষ কিছু ইবাদতকে এই পবিত্র মাসে নির্ধারিত করার মাধ্যমে শরীয়তের উদ্দেশ্য এমনটিই বোঝা যায় যে, এই পবিত্র মাসের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত এবং রিয়াজতের মধ্যে অতিবাহিত হউক। কিন্তু মানবীয় প্রয়োজনে মানুষ এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানবিক চাহিদাগুলো থেকে পরিপূর্ণ পৃথক হয়ে সর্বদা ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকা মানবসমাজের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। তাই মানুষের দুর্বলতা, অপারগতা, প্রয়োজনের চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে মহান রাব্বুল আলামীন বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী করে এই পবিত্র মাসে এমনভাবে ইবাদতকে ফরজ করেছেন যে, মানুষ যেন ওই ইবাদতের সাথে নিজের সব কাজকর্ম যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারে এবং ইবাদতও আদায় করতে পারে। এই বিশেষ প্রকারের ইবাদতকে রোযা বলা হয়। রোযা এমন এক আশ্চর্যজনক অনন্য ইবাদত, মানুষ রোযা রেখে নিজের সব কাজ আঞ্জাম দিতে পারে এবং কাজের সাথে সাথে রোযার সাওয়াবও পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই পবিত্র মাসের সঠিক মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পবিত্র রমাজান মাসে আমাদের করণীয় :

১. নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করা।

২. তাওবা-ইস্তিগফারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

৩. রমাজানের আগমনের ওপর আনন্দিত হওয়া। যাতে আত্মশুদ্ধি ও খোদাভীতি অর্জনের তাওফীক হয়। গুনাহের অথৈ সমুদ্র থেকে রহমতের সাহারা হাসিল হয়।

৪. পরিপূর্ণ আদব ও শিষ্টাচারের সাথে রোযা রাখা।

৫. তারাবীহর মধ্যে মনোযোগী হওয়া।

৬. অলসতা পরিহার করা।

৭. বিশেষ করে শেষ দশ দিনে শবে কদরের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করা।

৮. ভাবগাম্ভীর্যতা নিয়ে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করা। এমনকি অনেকবার পরিপূর্ণ খতমে কোরআনের চেষ্টা করা।

৯. রমাজান মাসে ওমরাহ করা।

১০. এই পবিত্র মাসে সদকার সাওয়াব দ্বিগুণ হয়ে যায় বিধায় বেশি বেশি সদকা করা।

১১. ই'তিকাফ করা।

রোযার সংজ্ঞা :

আরবী শব্দ সওম, ফার্সি শব্দ রোযা। আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় রোযা বলা হয় নিয়্যাতসহ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

রোযার ফজীলত :

রোযা শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোযার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগী থেকে রোযাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

যেমন (তিনি) এক হাদীসে কুদসীতে (বলেন), "মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭৬০)

এ হাদীস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি, নেক আমলের মাঝে রোযা রাখার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি।

তাই সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) যখন বলেছিলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোনো নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তুমি রোযা রাখো। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই।' (নাসাঈ শরীফ ২৫৩৪)

রোযার এত মর্যাদার কারণ কী তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো জানেন। তবে, আমরা যা দেখি তা হলো, রোযা এমন একটি আমল, যাতে লোকদেখানো ভাব থাকে না, বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়। নামায, হজ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কে করল তা দেখা যায়। পরিত্যাগ করলেও বোঝা যায়। কিন্তু রোযার ক্ষেত্রে লোকদেখানো বা শোনানোর সুযোগ থাকে না। ফলে রোযার মধ্যে ইখলাস, আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা নির্ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

'রোযাদার আমার জন্যই পানাহার ও সহবাস পরিহার করে।' (মুসলিম শরীফ ২৭৬৩)

☆ রোযাদার বিনা হিসাবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেওয়া হয় না। বরং প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বলেছেন,
'মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।' (মুসলিম শরীফ ১৫৫১)

☆ রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল :
যেমন হাদীসে এসেছে,
'রোযা হলো ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।' (মুসনাদে আহমদ ৯২১৪)
বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে,
'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এক দিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে এক খরিফ (সত্তর বছরের) দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।' (মুসলিম শরীফ ২৭৬৯)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,
'জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোযাদারগণই শুধু সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যখন তাদের প্রবেশ শেষ হবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারী শরীফ ১৭৯৭)

☆ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
'যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।' (বুখারী শরীফ ১৭৯০)

☆ রোযাদারের আনন্দ
যেমন হাদীসে এসেছে,
'রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ : একটি হলো ইফতারের সময়, অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।' (মুসলিম শরীফ ১১৫১)

☆ রোযা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'রোযা ও কোরআন কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, রোযা বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।' (মুসনাদে আহমদ ৬৬২৬)

☆ রোযা গুনাহ মাফের উপায় ও গুনাহের কাফফারা
হাদীসে এসেছে,
'মানুষ যখন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন-সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে, তখন নামায, রোযা, সদকা সে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।' (বুখারী শরীফ ১৭৯৫)
আর রমাজান তো গুনাহ মাফ ও মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।
হাদীসে এসেছে,
'যে রমাজান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বুখারী শরীফ ২০১৪)
ইহতিসাবের অর্থ হলো : আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্টচিত্তে কোনো ইবাদত করা।

রোযার হিকমত, লক্ষ্য ও উপকারিতা
(১) তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি অর্জন।
(২) শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করা।
(৩) রোযা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।
(৪) ঈমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার সুন্দর পন্থা।
(৫) ধৈর্য, সবর ও দৃঢ়সংকল্প সৃষ্টির মাধ্যম।
(৬) নিজেকে আখিরাতমুখী করার অনুশীলন।
(৭) আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া ও সৃষ্টি জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।
(৮) জাগতিকভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের উত্তম উপায়।

সাহরী খাওয়া :
রোযা রাখার জন্য সাহরী খাওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
'তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।' (বুখারী শরীফ ১৯২৩)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
'আমাদের ও ইহুদি-খ্রিস্টানদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম শরীফ ২৬০৪)

☆ দেরি করে সাহরী খাওয়া :
সাহরীর অর্থ হলো, যা কিছু রাতের শেষভাগে খাওয়া হয়। সুন্নাত হলো, দেরি করে সাহরী খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে সাহরী খেলে রোযা রাখতে অধিকতর সহজ হয়, ফজরের নামায আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহরী শেষ করা সুন্নাত নয়। সাহরীর সময় শেষ হলো কি না, তা জানার উপায় হলো স্বচক্ষে

পূর্বাকাশের শুভ্রতা দেখা, অথবা নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডার ও নির্ভুল ঘড়ির মাধ্যমে অবগত হওয়া।

☆ ইফতারে বিলম্ব না করা :

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আগমন ঘটে ও ইফতার করার সময় হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'মানুষ যত দিন পর্যন্ত সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন কল্যাণের সাথে থাকবে।' (বুখারী শরীফ ২৮৫২)

তিনি আরো বলেছেন,

'যত দিন মানুষ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইফতারে দেরি করে।' (আবু দাউদ শরীফ ২৩৫৫)

যে সকল খাদ্য দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব :

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে তবে শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুর না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।' (মুসনাদে আহমদ ১৩০১২)

☆ ইফতারের সময় দু'আ করা

রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়। কারণ ইফতারের সময়টা হলো বিনয় ও আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণের চরম মুহূর্ত। এ সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের মুহূর্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এটা রমাজানের প্রতি রাতে। প্রত্যেক রোযাদার বান্দার দোয়া কবুল হয়।' (বায়হাকী ৩৬০৫)

ইফতার করার পর এ দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

অর্থ: 'পিপাসা নিবারণ হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নির্ধারিত হলো।' (আবু দাউদ শরীফ ২৩৫৭)

রোযা রাখা যাদের ওপর ফরজ

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকীম, সুস্থদেহী মুসলিমের জন্য রোযা রাখা ফরজ।

যে ব্যক্তি এ সকল শর্তাবলির অধিকারী তাকে অবশ্যই রমাজান মাসে রোযা রাখতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে।' (বাকারা ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'যখন তোমরা রমাজানের চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে।' (মুসলিম শরীফ ১০৮১)

রোযার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল :

☆ পানিতে নেমে বায়ু ত্যাগ করলে রোযা ভাঙবে না, তবে অপারগতা ব্যতীত এরূপ করা মাকরূহ। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৯)

☆ বিনা প্রয়োজনে কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করলে বা চিবালে রোযা মাকরূহ হবে। (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/২২)

☆ ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেললে রোযা মাকরূহ হবে। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯)

☆ রোযা অবস্থায় ঝগড়াঝাটি করা ও গালমন্দ করা মাকরূহ। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৭৯)

☆ রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, মাজন বা কয়লা দিয়ে দাঁত মাজা মাকরূহ।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

☆ রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। কোনো ব্যক্তি যদি হাঁপানি অথবা অ্যাজমার কারণে ইনহেলার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, তাহলে রোযা ভাঙার অনুমতি আছে। তবে উক্ত রোযা পরে কাযা করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৩৯৫)

☆ ইচ্ছাকৃতভাবে মশা-মাছি বা ধুলোবালি খেলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি হঠাৎ অনিচ্ছায় মশা-মাছি বা ধুলোবালি গলায় ঢুকে পড়ে তাহলে রোযা ভাঙবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৯৮)

☆ আগরবাতি জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করে ঘ্রাণ নিলে রোযা ভেঙে যাবে। অবশ্য আতর বা ফুলের ঘ্রাণ, যেগুলোর ধোঁয়া হয় না এগুলোর ঘ্রাণ গ্রহণ করলে রোযা ভাঙবে না। (দুররে মুখতার (১/১৪৯)

☆ দাঁতের ফাঁকে গোশতের টুকরা বা এ-জাতীয় কিছু আটকে ছিল। তা বের করে মুখের বাইরে এনে পুনরায় যদি খেয়ে ফেলে, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। পরিমাণে যত অল্পই হোক না কেন। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৮)

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য যদি বুটের বরাবর হয়, বা বড় হয়, এ পরিমাণ খাদ্যবস্তু গিলে ফেলার কারণে রোযা ভেঙে যাবে। আর যদি বুটের পরিমাণ থেকে কম হয়, তাহলে মুখের ভেতর থেকে গিলে ফেলার কারণে রোযা ভাঙবে না। হ্যাঁ, এ পরিমাণ বস্তু যদি মুখের বাইরে এনে পুনরায় খেয়ে নেয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

☆ মুখের ভেতর পান থাকা অবস্থায় ঘুমানোর পর যদি সুবহে সাদিকের পূর্বেই জাগ্রত হয় এবং সাথে সাথে মুখ পরিষ্কার করে নেয়, তাহলে রোযার

কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি সুবহে সাদিকের পর জাগ্রত হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (বেহেশতী জেওর ৩/১৪)

☆ রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কুলি করার সময় যদি পানি গলার ভেতর চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (দুররে মুখতার ১/১৫০)

☆ রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ইচ্ছাকৃত বমির পরিমাণ সামান্য হয়, তাহলে ভাঙবে না। এমনিভাবে অনিচ্ছাবশত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভাঙবে না। (আল হিদায়া ১/২১৮)

বমি মুখে চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে। যদিও পরিমাণে কম হয়। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৪১৫)

☆ কংকর, লোহা ইত্যাদি, যা মানুষ খাদ্য বা ওষুধ হিসেবেও খায় না, এসব জিনিস খাওয়ার কারণে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (কুদুরী পৃ.৮১)

☆ রোযা ভেঙে গেছে মনে করে কোনো কিছু ভক্ষণ করল (যেমন– ভুলবশত কিছু খাওয়ার পর মনে করল রোযা ভেঙে গেছে, এরপর আবার ভক্ষণ করল) তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। তাকে কাযা করতে হবে। তবে কাফফারা দিতে হবে না। (হিদায়া ১/১৮৭)

☆ কোনো কারণে রোযা ভেঙে গেলেও দিনের বেলায় পানাহার করা যাবে না। সারা দিন রোযাদারের মতো থাকা ওয়াজিব। (হিদায়া ১/১৮৫)

☆ কানে তেল বা ওষুধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে গোসল করার সময় যদি অনিচ্ছাবশত কানে পানি প্রবেশ করে, তাহলে রোযা ভাঙবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬)

☆ কাউকে আঘাত করার বা অন্য কোনো ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক পানাহার করালে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (আল হিদায়া ১/২১৭)

☆ পায়খানার রাস্তায় ডুশ ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪)

☆ মহিলাদের যোনি পথের ভেতর কোনো ওষুধ ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/২৪)

☆ সূর্য ডুবে গেছে ধারণা করে ইফতার করার পর যদি জানা যায় সূর্য ডোবেনি, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (হিদায়া ১/২২৫)

☆ রোযা অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হয়ে যদি পেটে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি রক্ত পেটে না গিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে, তাহলে রোযা ভাঙবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৮)

☆ রোযা অবস্থায় পানি যদি নাকের ভেতর দিয়ে পেটে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০২)

☆ ঘুমন্ত অবস্থায় কোনো কিছু পানাহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২)

☆ রোযা অবস্থায় মহিলাদের হায়েয বের হলে রোযা ভেঙে যাবে। পরে তা কাযা করে নেবে। কাফফারা দিতে হবে না।

যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব :

☆ শরীরে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ওজর ছাড়া রমাজানের রোযা রেখে ইচ্ছাকৃত ভেঙে ফেললে তার জিম্মায় কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (কিতাবুল ফিকহ ১/৯০৬)

☆ রোযা রেখে খাদ্য বা খাদ্যজাতীয় কোনো জিনিস (যার প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ আছে এবং খাবারের চাহিদাও পূরণ হয়) শরয়ী ওজর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (কিতাবুল ফিকহ ১/৫৩০)

☆ রমাজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ে রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রোযা ভেঙে যাবে এবং উভয়ের ওপর কাযা কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রীকে বাধ্য করে, তাহলে স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। (দারুল উলুম ৬/৪৩৯)

☆ রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ধূমপান করলে রোযা ভেঙে যাবে। এতে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫)

☆ সুবহে সাদিক হয়ে গেছে নিশ্চিত জেনেও আযান শোনা যায়নি বা এখনো অন্ধকার বাকি আছে, এরূপ ভিত্তিহীন অজুহাত দাঁড় করিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার রোযা সহীহ হবে না। বরং তার ওপর কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (মারিফুল কোরআন ১/৪৫৪)

কাফফারার পদ্ধতি :

১. প্রতিটি রোযার জন্য দুই মাস (হিজরী গণনায়) ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার নাম কাফফারা। যে ব্যক্তি এভাবে রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তার জন্য শরীয়তে বিকল্প হিসেবে একটি দাস আযাদ করার বিধান রেখেছে। বর্তমানে যেহেতু দাস-

দাসীর প্রচলন নেই, তাই তার বিকল্প হিসেবে শরীয়তের আরেকটি বিধান হচ্ছে, প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। এটাই রোযার কাফফারা।

২. কাফফারার রোযা আদায়কালীন তার ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলে বরং কোনো একটি রোযা মাঝখানে ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে রোযা শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পেছনের রোযাগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে। কাফফারার রোযা হিসেবে পরিগণিত হবে না।

৩. মহিলাদের মাসিক ঋতুর কারণে ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হলে শরীয়তে তা ওযর হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ এ কারণে পুনরায় নতুন করে রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। পূর্বের রোযাগুলো কাফফারাস্বরূপ গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় রোযা আরম্ভ করতে হবে। এক দিনও বিলম্ব হয়ে গেলে ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে না। বিশিষ্ট ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন, 'যার ওপর কাফফারা হিসেবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা জরুরি, সে যদি মাঝখানে অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা রাখতে না পারে তাহলে আবার নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে হবে।" কেননা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। (আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৭)

উল্লেখ্য, মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণ অসুস্থতা নয়। বিধায় এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

৪. রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। বরং যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা ভিন্ন কারণে রোযা রাখতেই অক্ষম, তার জন্য ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর বিধান সীমাবদ্ধ।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রমাজান মাসে রোযাই রাখেনি। এমন ব্যক্তির ওপর কাযা ওয়াজিব, কাফফারা নয়। তার জন্য পরকালে ভয়ানক ও কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে। শুধু কাযা দ্বারাও তার অপরাধ ক্ষমা হবে না। হ্যাঁ, হালকা হতে পারে।

৫. এক রোযার কাফফারা আদায় করার পূর্বেই যদি কেউ একাধিকবার ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙে ফেলে, তাহলে সবকটি রোযার জন্য একটি কাফফারাই যথেষ্ট। তবে পৃথকভাবে প্রতিটি রোযার কাযা আদায় করতে হবে। অন্যথায় প্রতিটি রোযার জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা দিতে হবে। (মাহমুদিয়া ১৫/২০৬)

যেসব কারণে রোযা ভাঙবে না :

☆ ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (বুখারী হা. ১৯৩৩)

☆ রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা বা শরীরে তেল, আতর ইত্যাদি ব্যবহার সম্পূর্ণ জায়েয। এতে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি যদি সুরমা ব্যবহারের পর থুথু কিংবা শ্লেষ্মায় রং পরিলক্ষিত হয়, তবুও রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফাতহুল কাদির ৪/৩২৭)

☆ রোযা অবস্থায় যদি দুই-এক ফোঁটা চোখের অশ্রু মুখে চলে যায় এতে রোযা ভাঙবে না। যদি এত বেশি অশ্রু প্রবাহিত হয় যে, নোনা অনুভব হয় এবং গলার ভেতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৩০২)

☆ কুলি করে থুথু ফেলে দেওয়ার পর অবশিষ্ট আদ্রতা যদি ভেতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভাঙবে না। (ইলমুল ফিকহ ৩/৩২)

☆ নাকের শ্লেষ্মা বা মুখের লালা গেলার কারণে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/২০৩)

☆ অনিচ্ছাবশত কানে পানি প্রবেশ করলে রোযা ভাঙবে না। (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/২৫)

☆ হঠাৎ গলার ভেতর মশা-মাছি, ধুলোবালি অথবা ধোঁয়া ঢুকে পড়লে রোযা ভাঙবে না। হ্যাঁ, ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কিছু করলে রোযা ভেঙে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫)

☆ কোনো ধরনের ইঞ্জেকশন-ইনসুলিন বা টিকা নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না, এমনকি গ্লুকোজ ইঞ্জেকশনের দ্বারাও রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। (ফাতাওয়ায়ে ওসমানী ২/১৮৬)

☆ রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহারের দ্বারা রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। যদিও ওষুধের স্বাদ মুখে অনুভূত হয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/২০৩)

☆ রোযা অবস্থায় এনডোসকপি করার হুকুম :

দেহের অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করার জন্য এনডোসকপি করা হয়। এ সময় গলা দিয়ে পেটের ভেতরে পাইপ প্রবেশ করানো হয়। যদি এই পাইপে তেল, পানি বা অন্য কোনো পদার্থ লাগানো থাকে, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। আর যদি তেল বা কোনো পদার্থ লাগানো না থাকে, বরং সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকে, তাহলে এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৯)

☆ রোযা অবস্থায় কোনো প্রকার মেডিসিন ব্যতীত অক্সিজেন গ্রহণ করার দ্বারা রোযা ভাঙবে না। আর যদি কোনো ওষুধ মিশ্রিত থাকে, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। (জাদীদ ফেকহী মাসায়েল ১/৮৮)

☆ রোযা অবস্থায় ইনসুলিন ব্যবহার করা জায়েয। এতে রোযা ভাঙবে না। (আল ইসলাম ওয়াতিব্বুল হাদীস পৃ. ২৮৫)

☆ রোযার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে শরীরে স্যালাইন পুশ করা মাকরূহ। তবে রোগের কারণে শরীরে স্যালাইন নেওয়া যাবে। এতে রোযা ভাঙবে না। (আল ইসলাম ওয়াতিব্বুল হাদীস পৃ. ২৮৫)

☆ রোযা অবস্থায় রক্ত দিলে বা নিলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফাতহুল কাদির ৪/৩২৭)

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৭

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রার লেনদেনের আরো এক আধুনিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি :

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার লেনদেনের আরো একটি পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। পদ্ধতিটি হলো, আমেরিকা থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্য সার্কুলার করা হয়। একজন ব্যক্তি ঢাকায় বসে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কম্পিউটার স্ক্রিনে উক্ত মূল্য তালিকা দেখতে পারে। মুদ্রার মূল্য দেশের বিরাজমান অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাই কখনো বেশি হয় আবার কখনো কম। ওই ব্যক্তি উক্ত মূল্যের ওপর মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে। অথচ নিয়মানুসারে ওই ব্যক্তি সরাসরি উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না বরং কোনো কোম্পানির মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ওই দিকে কোম্পানির থাকে নিজস্ব স্বতন্ত্র নীতিমালা। তা হলো, দুই লক্ষ ডলারের একটা লট থাকে, যা কোনো ব্যক্তি ক্রয় করে তা পুনঃ বিক্রি করতে পারে, কিন্তু ওই ব্যক্তিকে উক্ত লটের ৫% কোম্পানির নিকট জমা করতে হয়, যা শুধু ১০০০ ডলার হয়ে থাকে। এক হাজার ডলার দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট খোলার পর ওই ব্যক্তি এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, দুনিয়ার যেকোনো মার্কেটে সে একটা লট ক্রয় করতে পারে। ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোম্পানি জামানত হিসাবে জমা করে, এমনিভাবে ওই ব্যক্তির এক হাজার ডলারের বিনিয়োগ হলো কিন্তু লেনদেন করছে দুই লক্ষ ডলারের। অর্থাৎ সে দুই লক্ষ ডলারের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

এখন দেখার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির লাভ-লোকসান কিভাবে হয়? এর পদ্ধতি হলো, ওই ব্যক্তি কম্পিউটার স্ক্রিনে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে মুদ্রার মূল্য খতিয়ে দেখে এবং ওই দিকে মুদ্রা বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ মতামত মুহূর্তে মুহূর্তে তুলে ধরতে থাকে যে, ভবিষ্যতে মুদ্রার মূল্য বাড়বে না কমবে? তা ছাড়া ওই ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন দেশের মুদ্রাবিষয়ক খবরাখবর পেতে থাকে এবং কম্পিউটারেই বিপরীত গ্রাফের মাধ্যমে উক্ত মুদ্রার অবস্থা জেনে নেয় যে আগামী মুহূর্তে উক্ত মুদ্রার কী অবস্থা হবে? উল্লিখিত সব ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই ব্যক্তি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ওই লট ক্রয় করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ডলারের মূল্য ৬০ টাকা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। এরপর ওই ব্যক্তি কোম্পানির মাধ্যমে যোগাযোগ করে ওই ব্যাংক থেকে এর সত্যতা যাচাই করবে যে, আপনি/আপনারা ডলারের যে মূল্য দিয়েছেন, তা সত্যিই বিক্রয় মূল্য কি না? এতে উক্ত ব্যাংক সত্যায়ন করে। এরপর ওই ব্যক্তি এর সাথে মৌখিক ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, আমি একটা লট ক্রয় করলাম এবং ওই লটটা আমার হয়ে গেল। এখন সর্বপ্রকারের লাভ-লোকসানের ভার তাকেই নিতে হবে। এ ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়াতে অনুভবযোগ্য কোনো কবজের (Physicl Possion) প্রশ্নই আসে না। কেননা উক্ত মুদ্রা এ থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু আইনত কবজ (Constructive possion) হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই মুদ্রা তার জিম্মায় চলে এসেছে। যখন ওই মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাবে, তখন সে ঠিকই টেলিফোনের মাধ্যমে তা বিক্রি করে দেবে। মূল্য বৃদ্ধি পেলে লাভ ও মূল্য কমলে লোকসান তাকেই বহন করতে হবে। মধ্যখানে যেই কোম্পানি রয়েছে, সে উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত সুবিধাদি সরবরাহ করে থাকে।

১. টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ। ২. মার্কেট, যেখানে বসে লেনদেন করা যায়। ৩. ইন্টারনেট সিস্টেম।

উপরোক্ত সুবিধাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যখন একবার মুদ্রা ক্রয় করে তা বিক্রি করে দেয়, এটিকে একটি পূর্ণ ট্রেড ধরা হয়।

ওই এক ট্রেডের ওপর কোম্পানি ৬০ ডলার কমিশন গ্রহণ করে। উক্ত ট্রেডে লাভ হোক বা লোকসান। কোম্পানি উক্ত নির্ধারিত কমিশন ওই সময় গ্রহণ করে যদি ওই দিন ক্রয়কৃত মুদ্রা বিক্রয় করে দেয়। যদি ক্রয়ের দিনে মুদ্রার যথাযথ মূল্য না পাওয়ার কারণে ওই দিন বিক্রি না করে বরং পরের দিন বা কিছুদিন পর বিক্রি করতে চায় তাহলে কোম্পানি নির্ধারিত ৬০ ডলার ব্যতীত প্রতিদিনের হিসাবে ২০ ডলার অতিরিক্ত কমিশন নিয়ে থাকে। কেননা কোম্পানির দুই লক্ষ ডলার উক্ত কারবারের সিকিউরিটি মানি হিসাবে জমা রয়েছে এর ওপর কোম্পানি দৈনিক ২০ ডলার কমিশন নেবে। বর্তমানে সারা বিশ্বে দৈনন্দিন ট্রিলিয়ন ডলারের লেনদেন এভাবে সংঘটিত হচ্ছে, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বৃহদাকারের লেনদেন

হলো এটা। উক্ত পদ্ধতিতে এই লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত কারণে নাজায়েয।

১. আমাদের যতটুকু অবগতি রয়েছে। এ ধরনের কাজকর্মে যখন কোনো লট ক্রয় করা হয়, তখন ওই লট ক্রেতাকে পৃথকভাবে নির্ধারণ করে হস্তান্তর করা হয় না। বরং এর অ্যাকাউন্টে লিপিবদ্ধ করা হয় মাত্র। এরপর সে যখন অন্যকে উক্ত লট বিক্রি করে তখন এতে যদি লাভ হয় তাহলে শুধু লাভটা তাকে ফেরত দেয়। যদি লোকসান হয় তাহলে এর থেকে ক্ষতির অংশটা নিয়ে নেওয়া হয়। মোট কথা, ক্রয়কৃত পূর্ণ লট স্থানান্তরিত হয় না বরং ডকুমেন্টারিভাবে এর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে দেওয়া হয় এবং পরিশেষে লাভ-লোকসানের ব্যবধানটা সমান করে নেওয়া হয়, যা জুয়ারই একটা প্রকার।

২. মুদ্রার আইনত কবজ হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট নয় যে, মুদ্রার মূল্য কমবেশ হওয়ার ক্ষতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জিম্মায় হয়ে যাবে বরং কবজার জন্য জরুরি হলো ক্রয়কৃত মুদ্রাকে অবিক্রীত মুদ্রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নিতে হবে, এবং ক্রেতা নিজে কবজ করবে অথবা তার নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি কবজ করবে। অর্থাৎ এমনভাবে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবে যে, যদি উক্ত নির্ধারিত মুদ্রা আগুনে পুড়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতি যাতে ক্রেতার দায়িত্বে বোঝা যায়। অথচ এ ধরনের কবজ উক্ত লেনদেনে হয় না।

উল্লেখ্য, শরীয়াহ দৃষ্টিকোণে মুদ্রা এবং অন্য জাতীয় বস্তুর নির্ধারণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, অন্য জাতীয় বস্তুগুলো ইশারা-ইঙ্গিতে বা নিদর্শন ও চিহ্ন দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু মুদ্রা ওই সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হয় না, যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি নিজে বা এর প্রতিনিধির মাধ্যমে কবজ করবে না।

৩. উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা কেবলমাত্র এক হাজার ডলার আদায় করে থাকে অবশিষ্ট ডলার আদায় করে না, যদিও অবশিষ্ট টাকা তার কোম্পানি সিকিউরিটি মানি হিসাবে জমা রাখে। কিন্তু ওই টাকা মূলত ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ হয়। অপরদিকে মুদ্রা বিক্রেতা ক্রেতাকে উপরোক্ত শরীয়াহ পদ্ধতিতে কবজ দেয় না ফলে টাকাগুলো উভয় দিকে ঋণ হয়। সুতরাং বাঈউল কালী বিল কালী বা ঋণের বিনিময়ে ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে উক্ত লেনদেন জায়েয হবে না।

৪. মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি, যা কমিশন গ্রহণ করে থাকে তা হয়তো জামানতের ফি হবে অথবা কোম্পানির দেওয়া টাকার বিনিময় হবে, যা উক্ত কোম্পানি ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে আদায় করে থাকে। প্রথম অবস্থায় এটা হবে কাফালার ফি এবং দ্বিতীয়াবস্থায় হবে ঋণের ওপর সুদ অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টা নাজায়েয।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'কোয়ান্টাম মেথড' প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

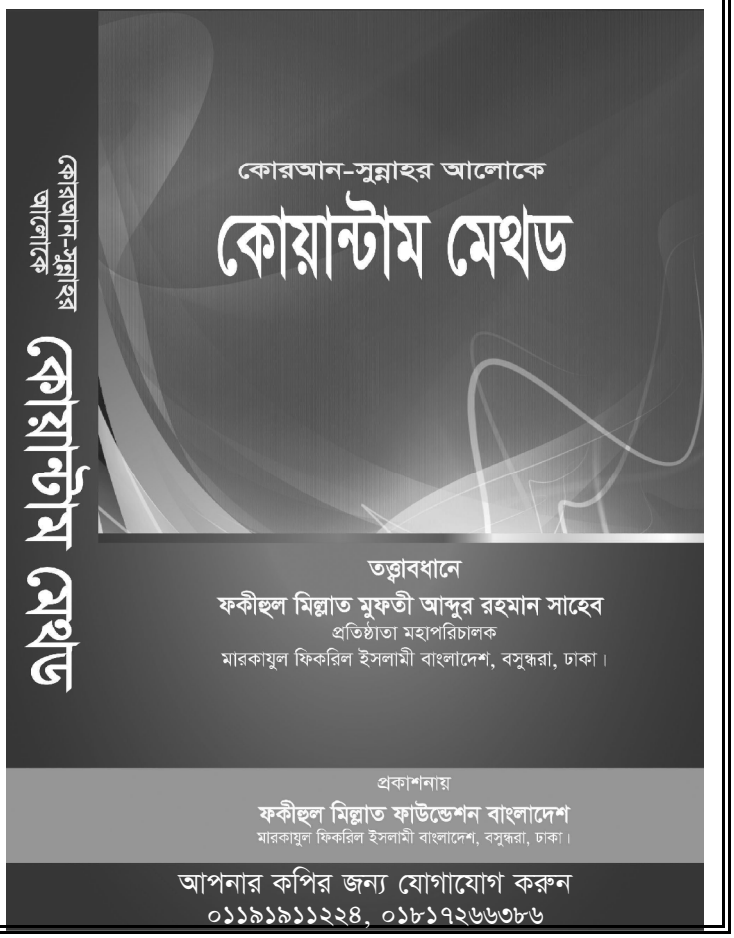

পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে
শবে বরাত

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টিজগতে এক বস্তুর ওপর আরেক বস্তুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন স্থান হিসেবে মক্কা-মদীনা অন্যান্য স্থান থেকে সর্বোত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। কূপের মধ্যে জমজম সর্বশ্রেষ্ঠ। সাপ্তাহিক দিনের মধ্যে জুমু'আর দিন শ্রেষ্ঠ। মাসের মধ্যে রমাজান সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যদিক দিয়ে শা'বান মাস শ্রেষ্ঠ। রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদর শ্রেষ্ঠ। অন্যদিক থেকে লাইলাতুল বারাত শ্রেষ্ঠ। এসব মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। এ উপহারগুলো গ্রহণ করে উক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান, দিন-রাত ও সময়কে মুমিনগণ কাজে লাগিয়ে যত বেশি আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ হিকমাত উক্ত মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে উক্ত শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহের বিবরণ দিয়েছেন এবং তাতে ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য মুমিনদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। বাতলিয়ে দিয়েছেন কী রূপে ইবাদত করে উক্ত ফজীলত অর্জন করা যাবে।

মুমিনদের জন্য উচিত ও জরুরি হলো, এসব বিষয়কে আঁকড়ে ধরা এবং যথাসাধ্য ইবাদত ও যিকির-আযকারে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্রত হওয়া।

এরূপ বিষয়াদিতে শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফে শবে বরাত সম্পর্কে এত অধিক ফজীলতের কথা বিবৃত হয়েছে মুসলমান মাত্রই এর গুরুত্ব-মর্যাদা ও ফজীলত অনুধাবন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় উক্ত ফজীলত অর্জনের চেষ্টা না করে পারে না।

তাই প্রারম্ভ যুগ থেকে সলফে সালেহীন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাহ অনুযায়ী শবে বরাতকে উদ্‌যাপন করে এসেছেন।

বর্তমান আধুনিক যুগে কিছু লোক মুমিনদেরকে শবে বরাতের ফজীলত থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে এতদসম্পর্কে উদ্ভট ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করতে দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে, শবে বরাতের ফজীলত হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। এমনকি শবে বরাতকে বিদআত বলার স্পর্ধাও দেখায় তারা। আবার কিছু মহল শবে বরাতের খাস আমলের নামে বিভিন্ন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদেকে শবে বরাতের সুন্নাত তরিকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যস্ত। উভয় পন্থাই মুসলমানদের জন্য বর্জনীয়।

এই নিবন্ধে শবে বরাতের পরিচয়, হাদীস শরীফে শবে বরাতের ফজীলত, এতদসংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনের সিদ্ধান্ত, শবে বরাতে করণীয় এবং বর্জনীয় আমল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শবে বরাতের নামকরণ :

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতই আমাদের কাছে শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। যার আরবী হলো 'লাইলাতুল বারাআত'। ফার্সি 'শব' আর আরবী 'লাইলাতুন' অর্থ রজনী, রাত। 'বারাত' বা 'বারাআত'-এর অর্থ হলো মুক্তি, পরিত্রাণ। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় 'পরিত্রাণের রজনী'। যেহেতু হাদীস শরীফে বারবার বিবৃত হয়েছে, এই রাতে আল্লাহ রাববুল আলামীন মুসলমানদেরকে মাগফিরাত বা গুনাহ থেকে পরিত্রাণ দেন তাই এই রাতের নামকরণ করা হয়েছে 'লাইলাতুল বারাআত' বা 'শবে বরাত'।

হাদীসের পরিভাষায় এই রাতের নাম হলো ليلة النصف من شعبان "মধ্য শাবানের রাত"।

অনেক নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরে কেরামের মতে, শবে বরাতের কুরআনিক পরিভাষা হলো ليلة مباركة "লাইলাতুম মুবারাকা"। তাঁদের মতে, সূরা দোখানের আয়াত انا انزلناه فى ليلة مباركة الخ "নিশ্চয় আমি কোরআন নাযিল করেছি মুবারাক রাতে" থেকে উদ্দেশ্য ليلة النصف من شعبان অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত। এতদসম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

হাদীস শরীফে শবে বরাতের ফজীলত :

হাদীস নং-১

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

হযরত মু'আয (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি

নিবদ্ধ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।

(সহীহে ইবনে হিব্বান ১২/৪৮১ হা. ৫৬৬৫, ইবনে আসেম ফিসসুন্নাহ হা. ৫১২, তাবারানী [কাবীর] ২০১০৯ হা. ২১৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৯/২৪ হা. ৬২০৪, মুসনাদুশ শামিঈন [তাবারানী] ১/১২৮ হা. ২০৩)

হাদীসটি সহীহ। (তাবরানী বলেছেন এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য)

হাদীস নং-২

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ": يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ :مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং বিদ্বেষপোষণকারী ও খুনি ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।

(মুসনাদে আহমদ ১১/২১৬ হা. ৬৬৪২)

হাদীসটি সহীহ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫)

অনুরূপ হাদীস আরো যে সকল সাহাবী থেকে বর্ণিত তা নিম্নরূপ :

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (বাযযার হা. ২৪৪৬)

৪। হযরত আবু সালাবা খুশানী (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (আসসুন্নাহ লিইবনে আসেম ১/২২৩, তাবারানী [জামে কাবীর] ২২/২২৩ হা. ৫৯০)

৫। হযরত আবু বকর (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (বাযযার হা. ২০৪৫, ইবনে খুযাইমা [ফীততাওহীদ] পৃ. ১৩৬, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] হা. ৩৮২৮, ৩৮২৯, ইবনে আবী আসেম হা. ৫০৯, লালকায়ী ৭৫০)

৬। হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (মুসনাদুল বাযযার ৭/১৮৬)

৭। হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/৩১৬ হা. ৭৯২৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/১০৮ হা. ২৯৮৫৯)

৮। আবু মুসা আশআরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত...। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৪৫)

হাদীস নং-৯

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ :هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ "

হযরত উসমান ইবনে আবীল আস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মধ্য শা'বানের রজনীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, কেউ কি ক্ষমাপ্রার্থী আছো আমি তার গুনাহ ক্ষমা করব? কেউ কি কিছু চাওয়ার আছো আমি তাকে দান করব? মুশরিক এবং যিনাকারী ছাড়া যেই চাইবে, আমি তাকে দিয়ে দেব। (শু'আবুল ঈমান ৫/৩২৬, দুররে মনসূর লিসসুয়ূতী)

হাদীস নং-১০

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ :وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ " :خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ : لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, পাঁচটি রাত আছে; যে রাতে দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না। তার মধ্যে একটি হলো মধ্য শা'বানের রজনী।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪/৩১৮ হা. ৭৯২৭)

হাদীস নং-১১

عن عائشةؓ---هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَتْ :مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ :فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ-

হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমার কি জানা আছে এই রাত তথা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে কী হয়? হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এই বছর যারা জন্ম নেবে এবং যারা মৃত্যুবরণ করবে, সব এই রাতে লেখা হয়। এই রাতে বান্দার সারা বছরের আমল উত্তোলন করা হয় এবং সারা বছরের রিযিক বণ্টন করা হয়। (দাওয়াতুল কাবীর [বায়হাকী] ২/১৪৫ হা. ৫৩০)

হাদীস নং-১২

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ " :مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا فَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ."قَالَ الشَّافِعِيُّ " :وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ :إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ ,فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ," قَالَ " :وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ جَمْعٍ ,وَلَيْلَةُ جَمْعٍ هِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ؛

فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ " :يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ :لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ " :أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ " :هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে তিনি এমন দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি মারাই গিয়েছেন। আমি যখন অবলোকন করি, তখন বিছানা থেকে উঠে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নাড়া দিই। এতে করে তাঁকে সচেতন বুঝতে পারি, আমার বিশ্বাস হলো তিনি জীবিত আছেন। অতঃপর নিজ বিছানায় ফিরে এলাম। তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। নামায সমাপ্ত করে তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কী ধারণা হয়েছে? নবী কী তোমার সাথে সীমা লঙ্ঘন করেছে? আমি বলি, জি না, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তবে আপনার দীর্ঘ সিজদার কারণে আমার মনে হয়েছে আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো আজকের এ রাতটি কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

لِأَنَّ فِي صُبْحِهَا النَّحْرُ

হযরত আবুদ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে লোক সাওয়াবের আশায় ঈদের রাত্রে ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তর ওই দিনও জাগ্রত থাকবে, যেদিন সকলের অন্তর মুরদা থাকবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, পাঁচ রাতের দু'আ কবুল হয়, জুমু'আর রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতিরের রাত, রজবের প্রথম রজনী এবং মধ্য শা'বানের রজনী।" (সুনানে কাবীর [বায়হাকী] ৩/৪৪৫ হা. ৬২৯৩, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৫/২৮৭ হা. ৩৪৩৮)

হাদীস নং-১৩

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ :أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ :إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রজনীতে আমি রাসূল (সা.) কে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। আমি বের হলাম। দেখতে পেলাম, তিনি জান্নাতুল বাকীতে আছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা হলো, আপনি অন্য স্ত্রীর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, মধ্য শা'বানের রজনীতে আল্লাহ রাববুল আলামীন দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং 'কালব' গোত্রের ভেড়ার পশমের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী ৩/১০৭ হা. ৭৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৪৪ হা. ১৩৮৯, মুসনাদে আহমদ ৪৩/১৪৬ হা. ২৬০১৮)

হাদীস নং-১৪

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ :أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"হযরত আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা মধ্য শা'বানের রজনীতে জাগ্রত থাকো এবং দিনে রোযা রাখো। সূর্যাস্তের সময় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছো কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা কের দেব। আছে কি কেউ রিযিক যাচনাকারী, আমি তাকে রিযিক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছো কি, আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেব। এরূপ কেউ আছো কি? এরূপ কেউ আছে কি? এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ ১/৪৪৪ হা. ১৩৮৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী (৫/৩৫৪)]

হাদীস নং-১৫

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ :قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ

বললেন, এ রাতটি মধ্য শা'বানের রাত (শবে বরাত)। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণার দৃষ্টি দেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের দয়া করেন, তবে হিংসুক ব্যক্তিদের স্বীয় অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন।"

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৫/৩৬১ হা. ৩৫৫৪, তারগীব তারহবী)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে অনুমিত হয়েছে, শবে বরাত বা মধ্য শা'বানের রজনীর গুরুত্ব, মহত্ব, তাৎপর্য ও ফজীলত অপরিসীম। এরূপ আরো বহু হাদীস বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে এই বিষয়ে।

এর মধ্যে কিছু সহীহ, কিছু হাসান আবার কিছু জয়ীফও রয়েছে শাস্ত্রিক বিশ্লেষণের দিক থেকে। তবে হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালা অনুসারে শাওয়াহেদের কারণে জয়ীফগুলোও হাসানের দরজায় পৌঁছে যায়। তদুপরি ইসলামের প্রারম্ভ যুগ থেকে এর ওপর আমল চলে আসাটা হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার বড় দলিল।

সামগ্রিকভাবে এসব হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের উক্তি তো আছেই স্বয়ং লামাযহাবী ঘরানার শায়খগণও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কে হাদীসগুলো দলিলযোগ্য।

লা-মাযহাবী আকাবিরদের বক্তব্য :

শায়খ আলবানী সাহেব বলেন–

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن فى هذا الحديث، فما نقله الشيخ القاسمى رحمه الله تعالى فى "إصلاح المساجد "عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس فى فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما ينبغى الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتى من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذى بين يديك .والله تعالى هو الموفق.

"শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের সার কথা হলো, এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো সামগ্রিকভাবে নিঃসন্দেহে সহীহ। হাদীস অত্যধিক দুর্বল না হলে এর চেয়ে কমসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ হিসেবে গণ্য হয়। (হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত) এই হাদীসের মানও তাই। অতএব ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থপ্রণেতা কাসেমী কতিপয় হাদীস বিশারদের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, "শবে বরাতের ফজীলতের ওপর কোনো সহীহ হাদীস নেই" তাঁর এই কথার ওপর আস্থা রাখা উচিত হবে না। তবে কেউ যদি এমনটা বলেই ফেলেন, তাহলে বুঝতে হবে অতি চঞ্চলতা এবং হাদীসের বিভিন্ন সূত্র অন্বেষণে হীনমন্যতা তাঁর মাঝে কাজ করছে। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা। (সিলসিলতুস সহীহা ৩/১৩৮)

লা-মাযহাবীদের পুরোধা **আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী** লিখেন,

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِى فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا .... فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

"জেনে রাখো! শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে তা প্রমাণ করে যে, এই রাতের ফজীলতের ভিত্তি আছে। যারা শবে বরাতের কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই বলে ধারণা রাখে, তাদের প্রতিপক্ষে হাদীসগুলো প্রমাণ বহন করে।" (তুহফাতুল আহওয়াজী ৩/৩৬৫)

শবে বরাত সম্পর্কে **আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)**-এর মতামতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন,

ومن هذا الباب :ليلة النصف من شعبان، فقد روى فى فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضى أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها ..... عليه كثير من أهل العلم، أو أكثرهم، من أصحابنا وغيرهم -على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية،

মধ্য শা'বান রাতের ফজীলত বিষয়ে অনেক হাদীস রাসূল (সা.) ও সাহাবা, তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো শবে বরাতের ফজীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পূর্বসূরিদের অনেকে এ রাতে নামাযে নিমগ্ন থাকতেন।... অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম এবং আমাদের অধিকাংশ সাথী এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর উক্তি দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়। কারণ এ বিষয়ে রয়েছে অনেক অনেক হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য পূর্বসূরিদের অনুসৃত আদর্শ। (ইকতিযাউস সিরাতিল হুদা ২/১৩৬)

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, শরীয়তে শবে বরাত একটি প্রমাণিত সত্য। একে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। যে সকল স্বার্থান্ধ স্বঘোষিত হাদিস বিশারদ হয়ে এসব অসংখ্য হাদীস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে শবে বরাত সম্পর্কে উদ্ভট কথাবার্তা বলে তারা মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারী হিসেবে পরিগণিত হবে কি না, বিবেচনার বিষয়। **আল্লামা ইবনুল হাজ মালেকী (রহ.)**-এর মাদখাল কিতাবটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই

কিতাবের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) লিখেন, "তিনি একটি কিতাব লিখেছেন। যার নাম মাদখাল। এটি খুবই উপকারী কিতাব। এতে তিনি ওই সমস্ত নিষিদ্ধ ও বিদআত আমলকে খুব স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে সব বিষয়ে মানুষ ভুলক্রমে জড়িয়ে পড়ে। অথচ এগুলো বেশির ভাগই বিদআত ও নিষিদ্ধ।"

এতে শবে বরাত সম্পর্কে লিখেন– "কোনো সন্দেহ নেই যে, শবে বরাত একটি বরকতময় রাত, সম্মানিত রাত। আমাদের সলফে সালেহীন (রা.) এই রাতের বড়ই সম্মান জানাতেন। শবে বরাত আগমণের আগে থেকে প্রস্তুতি নিতেন। আগমন করার পর এই রাত থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হতেন। (মাদখাল ১/২৯২)

শবে বরাতের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে **আল্লামা তকী উসমানী (দা.বা.)** বলেন, 'শবে বরাতের ফজীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়' এ কথা ভুল। মূল কথা হলো, ১০ জন সাহাবীর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (সা.) এই রাতের ফজীলত বর্ণনা করেছেন। তাতে কয়েকটি হাদীস সনদের দিক থেকে সামান্য দুর্বল। এসব সনদের দিকে দেখে অনেকে বলে দিয়েছেন যে, এই রাতের ফজীলতের কোনো ভিত্তি নেই। অথচ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো, কোনো বর্ণনার সনদ দুর্বল হলে এর সমর্থক হাদীস থাকলে তার দুর্বলতা কেটে যায়। আমি প্রথমেই বলেছি যে, এই রাতের ফজীলত সম্পর্কে ১০ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং যে রাতের ফজীলত সম্পর্কে ১০ জন সাহাবীর বর্ণনা পাওয়া যাবে তাকে ভিত্তিহীন বলা চরম ধৃষ্টতা।

ইসলামের স্বর্ণযুগ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন তবেতাবেঈনের যুগে এই রাতের ফজীলত থেকে উপকৃত হওয়ার গুরুত্ব ছিল। শবে বরাতে ইবাদতে মশগুল থাকার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন তাঁরা। সুতরাং একে বিদআত বলা উদ্ভট এবং ভিত্তিহীন মন্তব্য। সঠিক কথা হলো, শবে বরাত একটি ফজীলতসম্পন্ন রাত। এই রাতে ইবাদতের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও বিশেষ সাওয়াব রয়েছে।

তবে শবে বরাতের স্বতন্ত্র কোনো ইবাদত নেই, আবার এই রাতের জন্য ইবাদতের আলাদা কোনো নিয়মও নেই।

অনেক লোক শবে বরাতের ইবাদতের নামে বিভিন্ন নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে। যেমন নামাযের মধ্যে প্রথম রাক'আতে এই সূরা এতবার পাঠ করতে হবে, দ্বিতীয় রাক'আতে এই সূরা এতবার পাঠ করবে, শবে বরাতের নামায এত রাক'আত ইত্যাদি। এসবের কোনো ভিত্তি নেই। বরং নফল ইবাদত যত বেশি করা যায়, নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, দু'আ এবং তাসবীহ ইত্যাদি যথাসম্ভব বেশি বেশি করার চেষ্টা করা।

(মাহনামা আল-বালাগ- শা'বান ১৪৩১ হি.)

শবে বরাতে যেসব আমল করা যায় :

☆ এশা এবং ফজর নামায ওয়াক্ত মতে জামা'আতের সহিত আদায় করা।

☆ যথাসম্ভব নফল নামায এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা।

☆ সম্ভব হলে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা।

☆ কোরআন মজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা।

☆ বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

☆ অধিক হারে দু'আ করা।

☆ কখনও কখনও শবে বরাতে কবরস্থানের যিয়ারত করা।

☆ পরের দিন রোযা রাখা।

শবে বরাতে কবরস্থান যিয়ারত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় :

আল্লামা তকী উসমানী (দা.বা.) বলেন– 'এই রাতের আরেকটি আমল আছে তা হলো রাসূল (সা.) জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। যেহেতু রাসূল (সা.) এই রাতে জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়ে গেছেন তাই মুসলমানগণ শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) একটি কথা বলেছেন, যা সব সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, যে কাজ রাসূল (সা.) যে স্তরে করেছেন উক্ত আমল সে স্তরেই রাখা উচিত। যেহেতু রাসূল (সা.) পুরো জীবনে শবে বরাতে একবার জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়ে গেছেন আপনারাও পুরো জীবনে বরাতের রাতে একবার কবরস্থানে যান। কিন্তু প্রত্যেক শবে বরাতে গুরুত্ব সহকারে কবরস্থানে যাওয়া, একে জরুরি মনে করা, শবে বরাতের একটি স্বতন্ত্র আমল মনে করা, কবরে না গেলে শবে বরাত উদ্‌যাপন সফল হয়নি মনে করা সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। (প্রাগুক্ত)

শবে বরাতের আমল সম্পর্কে ফকীহগণের বাণী :

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেন, জলীলুকদর তাবেঈ যেমন হযরত খালেদ ইবনে মে'দান (রহ.), হযরত মকহুল (রহ.), হযরত লোকমান ইবনে আমের (রহ.) প্রমুখ শবে বরাতের খুবই সম্মান ও গুরুত্ব দিতেন। এ সময় তাঁরা বেশি বেশি ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। (লাতায়েফুল মাআরেফ ৪৪১)

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী (রহ.) লিখেন– "রমাজানের আখেরী ১০ রাত, দুই ঈদের রাত, যিলহজ্জার প্রথম ১০ রাত এবং শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত

রাত শববেদারী করা মুস্তাহাব। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে। (তারগীব তারহীবে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বাহরুর রায়েক ২/২৫)

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (রহ.) লিখেন– সফরে যাওয়ার সময় দুই রাক'আত নামায আদায় করা, দুই ঈদের রাত, মধ্য শা'বানের রাত, রমাজানের আখেরী ১০ রাত এবং যিলহজের প্রথম ১০ রাত শববেদারী করা মুস্তাহাব। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২, ৫২)

আল্লামা হাসান ইবনে আম্মার ইবনে আলী আশশারাম্বালালী (রহ.) লিখেন– শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শববেদারী করা মুস্তাহাব। (নূরুল ঈজাহ ওয়া হাশিয়ায়ে তাহতাবী ৪০০)

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো উল্লেখ করে লিখেন–

এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, শবে বরাত একটি অতি মূল্যবান এবং ফজীলতের রাত। আবার এও প্রতীয়মান হয়েছে যে উক্ত রাতে মুসলমানদের জন্য এই আমলগুলো করা সুন্নাত। ১। রাত জেগে নামায, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা। ২। আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফিরাত, সফলতা এবং উভয় জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দু'আ করা। (ফাজায়েল ওয়া আহকামে শবে বরাত ৮)

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى نَدْبِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ :أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيهِ . . . كَذَا . . . كَذَا . . . حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٣٥)

১৫ শা'বান রোযা রাখা :

ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, "১৫ শা'বানের রাত যখন আসে, তোমরা এই রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে উদ্‌যাপন করো এবং দিনের বেলা রোযা রাখো।"

এই হাদীস থেকে ১৫ শা'বান রোযা রাখার কথা প্রমাণিত হয়।

হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কালাম থাকলেও হাদীসটি বিভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য।

অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (সা.) শা'বান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। তদুপরি আইয়্যামে বিজ তথা প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখার কথা তো হাদীস শরীফে আছেই।

সুতরাং ১৫ শা'বানের রোযার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ صِيَامِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ، لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَا فُلَانُ أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ الرَّجُلُ :لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩١/٤٢)

শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়াদি :

শবে বরাতের নামে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। না কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত বা ইবাদতের নির্দিষ্ট নিয়ম প্রমাণিত আছে। তেমনি জামা'আতের সাথেও শবে বরাতের নামে কোনো ইবাদত করা যাবে না। যেমন শবে বরাতের নামে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ইত্যাদি।

শবে বরাতকে কেন্দ্র করে সমাজে কিছু বিদআত ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। যেমন, ১. ঘরবাড়ি, দোকান, মসজিদ ও রাস্তাঘাটে আলোকসজ্জা করা। ২. বিনা প্রয়োজনে মোমবাতি কিংবা অন্য কোনো প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। ৩. আতশবাজি করা। ৪. পটকা ফোটানো। ৫. মাজার ও কবরস্থানে মেলা বসানো। ৬. হালুয়া-রুটি, শিন্নি ও মিষ্টি বিতরণ ৭. কবরস্থানে পুষ্প অর্পণ ও আলোকসজ্জা ইত্যাদি। শরীয়তে এসব কাজের কোনো ভিত্তি নেই।

শবে বরাত উপলক্ষে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত বিদআত সম্পর্কে **হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ)** লিখেছেন, ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে মানুষ যে সকল নিন্দনীয় বিদআতের প্রচলন করেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ঘর ও দেয়ালে রাখা এবং এ নিয়ে গর্ব করা, আগুন নিয়ে অনর্থক খেল-তামাশার (আতশবাজি) জন্য জমায়েত হওয়া এবং পটকা ফোটানো। (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, শাহরু শা'বান, আল মাকালাতুস সালিসাহ)

এ সকল বিদআত ও কুসংস্কার থেকে আমাদের বেঁচে থাকা আবশ্যক। শবে বরাতকে ফজীলতপূর্ণ করা হয়েছে উত্তম আমল করে বেশি বেশি সাওয়াব অর্জনের জন্য। এর মধ্যে যদি বিভিন্ন বিদআত, কুসংস্কার ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয় তবে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের বোঝাই ভারী হবে।

সুতরাং শবে বরাত সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভট মন্তব্য করার ক্ষেত্রে যেমন সতর্ক হতে হবে, তেমনি শবে বরাতের নামে বিভিন্ন বিদআতের চর্চা থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। একটি ফজীলতের রাত হিসেবে এটিকে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকেই উদ্‌যাপন করতে হবে। তখন ইনশাআল্লাহ এই রাতের বরকত, ফজীলত ও হাদীস শরীফে উল্লিখিত নিয়ামত অর্জনে আমরা সক্ষম হব।

পোশাক সংস্কৃতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা

মাওলানা কাসেম শরীফ

পোশাক সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতার পরিচায়ক। পোশাকের মধ্য দিয়েই মানুষ তার সংস্কৃতি, জাতীয়তা, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব ও রুচির পরিচয় দিয়ে থাকে। যেসব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের গুণে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে আলাদা, পোশাক তার অন্যতম। লজ্জা স্থান ঢেকে রাখা যদিও পোশাক পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি কাঠফাটা রোদ আর হাড়কাঁপা শীত থেকে বাঁচার জন্যও মানুষ এ পোশাকেরই আশ্রয় নেয়। সৌন্দর্য, আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশেও পোশাকের জুড়ি নেই। জন্মগতভাবে মানুষ বস্ত্র পরিহিত হয়ে দুনিয়াতে আসে না, কিন্তু মানুষের স্বভাব, ফিতরত ও প্রকৃতি নগ্নতা ও বস্ত্রহীনতাকে মোটেও প্রশ্রয় দেয় না। তাই ধীরে ধীরে সেই বস্ত্রহীন শিশু বস্ত্রের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। বাড়ন্ত বয়স মানুষের কাছে নগ্নতা ও বস্ত্রহীনতাকে নেতিবাচক ও নিন্দনীয় করে তোলে। আবরণ ও আচ্ছাদন দিয়ে মানুষ নিজেকে ঢেকে রাখার তাগিদ অনুভব করেছিল সে আদিম আমলেই। কোরআনের ভাষ্য দেখুন–

فلما ذا قا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة (اعراف ٢٢)

অর্থাৎ অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জা স্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। (সূরা আ'রাফ-২২)।

লজ্জাশীলতা ও নগ্নতাকে ঢেকে ফেলার এই প্রবণতা মানুষের মজ্জাগত বলেই আদিম থেকে আধুনিক সব যুগেই পোশাক পরিধানকে সভ্যতার অংশ বিশেষ ভাবা হয়। হাল আমলের আমাজন জঙ্গলের গুহাবাসী মানুষদেরও দেখা যায়, লতাপাতা কিংবা পশুর চামড়া দিয়ে লজ্জা স্থান ঢেকে রাখতে। শত শত বছর ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল বাঙালির জীবন। অধীনতার জিঞ্জির ভেঙে মুক্ত বিহঙ্গের মতো দুই ডানা মেলে বাঙালি আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানিত্ব আর বাঙালিত্ব–এ দুয়ের চমৎকার মেলবন্ধনে বাঙালি জাতি নিজ জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে। তাই ধর্মীয় আচার ও আবহমান বাঙালির কালচার নিয়েই বাঙালির জীবন। এ দুইয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে বাঙালির অস্তিত্বকে কল্পনাই করা যায় না। তবে এটা সত্য যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় অতি আধুনিকতা ও তথাকথিত প্রগতিবাদের প্রভাবে বাঙালির জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন যে বাঙালিকে তার আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বের সংকটেই ফেলে দিচ্ছে, এ নিয়ে বিতর্কের সুযোগ সীমিত। চিন্তা-চেতনাও জীবনাচারের মতো এ পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাঙালির পোশাকেও। অতি সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্যুট-টাই পরে আসা কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'গরমে স্যুট-টাই পরে এসেছেন কেন? এটা কি আমাদের ড্রেস নাকি? এগুলো ব্রিটিশদের ড্রেস। ব্রিটিশদের গোলামি করেছেন, তার অভ্যাস এখনো যায়নি।' (প্রথম আলো : ৭/৪/১৫ ইং)।

প্রধানমন্ত্রীর এ বোধ অনুভূতি ও উপলব্ধিকে আমরা সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি, কেবল পোশাকই নয়, সব ক্ষেত্রেই গোলামির বৃত্তায়ন থেকে বাঙালি জাতিকে বের করে আনতে তিনি সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হবেন।

পোশাকের শরয়ী নীতিমালা :

ইসলাম তার সর্বব্যাপ্ত কর্মপন্থাও পরিপূর্ণতার আলোকে পোশাকের ক্ষেত্রেও বিশেষ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তবে এটা সত্য যে ইসলাম পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

كل ماشئت والبس ماشئت

অর্থাৎ (শরীয়তের সীমারেখায় অবস্থান করে) নিজেদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুসারে পানাহার করো এবং পোশাক পরিধান করো। (বুখারী)।

এই অবকাশের অর্থ এই নয় যে, ইসলামে ড্রেস কোড বা পোশাক নীতিমালা বলতে কিছু নেই। এর একটি প্রমাণ হলো, হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে নাজরান শহরের খ্রিস্টানদের সঙ্গে যে চুক্তিনামা করেছিলেন, তাতে লেখা ছিল–

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة كذاكذا لما قدمتم سألناكم الامان لانفسنا وذرارينا واهل ملتنا وشرطنا لكم على انفسنا۔۔۔ ولا نتشبه بهم (المسلمين) فى شئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة (السنن الكبيرى للبيهقى ١٩١٨٦)

অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি অমুক শহরের নাসারাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন ওমরের সঙ্গে লিখিত চুক্তি। যখন আপনারা (মুসলমানরা) আমাদের শহরে এসেছেন, তখন আমরা আপনাদের কাছে আমাদের নিজেদের, আমাদের

সন্তান-সন্ততি ও স্বধর্মের লোকদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আমরা নিজেদের ওপর এ শর্ত গ্রহণ করেছি যে ...আমরা মুসলমানদের পোশাক টুপি, পাগড়ি ইত্যাদিতে সাদৃশ্য গ্রহণ করব না। (সুনানে কুবরা, হা. ১৯১৮৬)।

অন্য বর্ণনায় আরো বিশদভাবে এসেছে–

ولا نتشبه بهم فى شئ من ملابسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر (اقتضاء الصراط المستقيم ٨٥).

অর্থাৎ আমরা (খ্রিস্টান বা জিম্মি) মুসলমানদের সঙ্গে পোশাক, টুপি, পাগড়ি, জুতা, চুল আঁচড়ানো (চুলের ফ্যাশন ও স্টাইল) ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করব না।

তাই সমকালীন কিছু মডারেট মুসলিম স্কলার যদি বলে বেড়ান যে, ইসলামী পোশাক বলতে কিছু নেই, তাহলে তা অজ্ঞতা বা স্বার্থবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পোশাকের শরয়ী নীতিমালা নিম্নরূপ : ১. পোশাকের আসল উদ্দেশ্য সতর আবৃত করা। ২. সৌন্দর্য ও সুরুচিবোধের অনুকূলে পোশাক পরিধান করা। ৩. বিজাতির অন্ধ অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকা। ৪. অহংকার ও প্রদর্শনের মানসিকতা পরিহার করে পোশাক পরিধান করা। ৫. পুরুষরা টাখনুর ওপর পোশাক পরিধান করা। ৬. নারী-পুরুষের পোশাকে পার্থক্য বজায় রাখা। ৭. পুরুষরা রেশমি কাপড় পরিহার করা। ৮. জাফরান, লাল ও হলুদ রঙের পোশাক পরিধান না করা উত্তম। ৯. ইসরাফ ও অপচয় থেকে বিরত থাকা। ১০. পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা। এ ১০টি মূলনীতির পেছনে শরয়ী পর্যাপ্ত প্রমাণাদি রয়েছে। এ আলোচনায় যেগুলোর অবকাশ নেই।

বাঙালির পোশাক সংস্কৃতি :

স্বার্থান্বেষী একটি মহলকে দেখা যায়, এ দেশের আপামর জনতার ধর্মীয় পরিচয় বিশেষত মুসলমানিত্ব আড়াল করার জন্য বাঙালিত্বের ধোঁয়া তুলে মুখের ফেনা বের করে ফেলেন। অথচ তাঁরাই বাঙালির হাজার বছরের পোশাক সংস্কৃতিকে 'গঙ্গার জলে বিসর্জন' দিয়ে বিজাতির বোল-চাল, বেশভূষা গ্রহণে যারপরনাই কোশেশে রত আছেন। তাঁদের চরিত্রের দ্বৈততা, বৈচিত্র্য ও স্ববিরোধিতা দেখে বেরসিক লোকদেরও রসবোধ জাগে। হাজার বছরের বাঙালির পোশাক সংস্কৃতি কী ছিল, একজন সেক্যুলার বাঙালি গবেষকের ভাষায় শুনুন–

'মুকুন্দরামের লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর আমলের অর্থাৎ ষোল শতকের শেষ দিকের সচ্ছল মুসলমানরা ইজার অথবা পায়জামা পরতেন। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনকেও ইজার পরতে দেখা যায়। তা ছাড়া, ধর্মমঙ্গলে মুসলমানদের লম্বা জামা এবং পাগড়ি পরার কথা লেখা হয়েছে।' (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ, পৃ. ৪৬৬, অবসর প্রকাশনী)।

'সতেরো শতকের শাহনামার পাণ্ডুলিপিচিত্রে সবারই মাথা ঢাকা দেখা যায়। আঠারো শতকের যেসব ছবি পাওয়া গেছে, তা থেকেও প্রায় সবার মাথায় বস্ত্র দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।' (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬৪)।

উনিশ শতক সম্পর্কে তিনি লিখেন, ইংরেজদের আগমন সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে পোশাকে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি সেকালের সবচেয়ে অভিজাত এবং নেতৃস্থানীয় লোকরাও লম্বা কোর্তা, চাপকান, জুব্বা এবং মাথায় হয় পাগড়ি নয়তো টুপি ছিল। এটাই ছিল অভিজাতদের ভদ্র পোশাক।' (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬৯)।

ইংরেজ আমল নিয়ে তিনি লিখেছেন, ইংরেজ আমলেও পোশাকের প্রতি সমাজের যে রক্ষণশীতা থাকে, তার জন্য পাশ্চাত্য পোশাক বাঙালি সমাজে ঢুকতে পারেনি। মেয়েদের ব্যাপারে এই রক্ষণশীলতার মাত্রা আরো বেশি ছিল। বিশ শতকের শেষেও মহিলা এবং পুরুষদের পোশাক তুলনা করলেও মহিলাদের পোশাকে রক্ষণশীলতা দেখা যায়।' (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭০)।

নারীদের পোশাক নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'নবাবী অথবা ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও কোনো বাঙালি মহিলাকে শাড়ি ছাড়া অন্য কোনো পোশাক পরতে দেখা যায়নি।' (ওই পৃ. ৪৭৩)। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, মুসলমান মেয়েরা সালোয়ার-কামিজও পরত এবং স্তন ঢেকে রাখার জন্য পরত ওড়না।' (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮০)।

এ জেড এম শামসুল আলম, সচিব পদমর্যাদায় তিনি সরকারি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন ইসলামী লেখক। সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি একাধিক বই লিখেছেন। বাঙালির পোশাক সংস্কৃতি নিয়ে তিনি লিখেন, 'বাঙালি মুসলিম ভদ্র শ্রেণীর অতীতের পোশাক ছিল পায়জামা, পাঞ্জাবি। সাধারণ মানুষের পোশাক ছিল লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি আর মুসলিম মেয়েরা ওড়না বা বোরখা জাতীয় অতিরিক্ত বস্ত্রে তাদের দেহ, বিশেষ করে বক্ষদেশ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন।' (বাঙ্গালি সংস্কৃতি এ জেড এম শামসুল আলম, মুহাম্মদ ব্রাদার্স পৃ. ৮৩ ও ৮৭)। সুতরাং বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালি নারী-পুরুষের যে পোশাক দেখা যায়, তা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

বাঙালির পোশাক সংস্কৃতির বিবর্তনধারা

ইংরেজ বেনিয়াদের অধীনতার শিকল-বেড়ি থেকে বাঙালি এখন মুক্ত, কিন্তু তাদের শোষণ, শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অংশ হিসেবে তারা পূর্বঘোষণা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের চেতনা ও সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে বাঙালির জীবনে-মননে। বাঙালির

জাগতিক ও আর্থিক অনগ্রসরতাকে কাজে লাগিয়ে তারা সে ঘোষণা অনুসারে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যার মাধ্যমে এমন এক সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে, যারা রক্তে, বর্ণে হিন্দুস্তানি, কিন্তু চিন্তা-চেতনা, ভাষা ও মানসিকতায় ইংরেজ।

তারপর ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হলো। নারীবাদী লেখিকা মালেকা বেগম মনে করেন, ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারার সংস্পর্শে বাঙালি সমাজ নতুনভাবে জীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করে।' (আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, পৃ. ২০৬)। জনাব শামসুল আলম সাহেব লিখেন, 'বাঙালি মুসলিমের আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে সহজ, সরল, সাদাসিধা পোশাক পাঞ্জাবির আবেদন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের প্যান্ট, শার্ট বাঙালি মুসলমানের দেহে দৃঢ় আসন গেড়ে বসে আছে।' (বাঙ্গালি সংস্কৃতি, পৃ. ৮৭)

ড. গোলাম মুরশিদ লিখেন, 'উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে পশ্চিমা পোশাক অথবা সে পোশাকের কিছু উপকরণ অনুপ্রবেশ করেছিল।' (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃ. ৪৭৩)।

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে নারীদের পোশাকেও। এর ক্রমধারা সম্পর্কে মালেকা বেগম বলেন, 'বাঙালি নারীর পোশাকে আধুনিকতার স্পর্শ লাগে উনিশ শতকের ষাটের দশকে। তবে নারীর পোশাকের শোভনতা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে আলোচনা ওঠার পর নারীরা সব ধরনের পোশাক পরতেই শুরু করে। আশির দশক থেকে নারীদের পোশাকে ইউরোপীয় ও দেশীয় ঢঙের অদ্ভুত মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।' (আমি নারী, পৃ. ৮৯, ৯১)।

এ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। ড. মুরশিদ মনে করেন, 'শহরের শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে অসনাতনী (অবাঙালি) পোশাকের প্রচলন শুরু হলেও পা এবং বুক যথেষ্ট ঢেকে রাখার রীতি বাঙালি সমাজে এখনও যথেষ্ট জোরালো। সে জন্য নামে মাত্র হলেও, সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে এখনও তাদের ওড়না পরতে হয়, তা সে ওড়নায় স্তন ঢাকুক, অথবা নাই ঢাকুক। ট্রাউজার-টপ পরা মেয়েরা অবশ্য ওড়না পরে না।' (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃ. ৪৮০)।

বর্তমানের ফ্যাশন ডিজাইন, মডেলিং, স্টাইলিং, নারীবাদীতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার জোয়ারে নারীরাও শার্ট, প্যান্ট, জিন্স, ফতুয়া, কাতুয়া, টি-শার্ট, গেঞ্জি, ওড়না ছাড়া উন্মুক্ত বক্ষ প্রদর্শন ও শর্ট কামিজ পরতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি কতটা বদলে গেল? নারীবাদী লেখিকা মালেকা বেগম লিখেন, আধুনিক নারীর প্রগতি দেখে অনেকে বিস্মিত, অনেকে উপমহাদেশীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একে মেলাতে পারছেন না কিংবা কেউ কেউ একে জাতীয় ভাবধারার বিরোধী বলে মনে করছেন। (আমি নারী, পৃ. ২০৭)।

এভাবেই ব্রিটিশদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি কেবল মুসলমানিত্বকেই ছুড়ে ফেলেনি, বাঙালিত্বকেও বিসর্জন দিয়েছে।

পর্দা, শালীনতা বনাম নগ্নতা ও আধুনিকতা :

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে হাজার বছরের বাঙালি নারীরা ভদ্রতা, শালীনতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিশ্বের নারী সমাজের আদর্শ ছিল। ড. গোলাম মুরশিদের ভাষায়, 'উনিশ শতক পর্যন্ত তো বটেই, এমনকি, বিশ শতকের গোড়াতেও হিন্দুদের মধ্যেও অন্তপুরের নিয়ম কম কঠোর ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পর্দা প্রথা ছিল অনেক কঠোর। কারণ ইসলাম ধর্মে পর্দার বিধান আছে।' (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃ. ৪৭৮)।

ইসলামের আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব হতে এ দেশের হিন্দুদের মধ্যেও অন্তপুর ও অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। (নারী নির্যাতনের রকমফের, পৃ. ১৬৭, সরকার সাহাবুদ্দীন আহমেদ)। বরং মুসলিম সমাজের চেয়েও হিন্দু সমাজে পর্দার কঠোর প্রয়োগ দেখা গেছে। সে সমাজে নারীদের অন্য নারীদের সঙ্গেও পর্দা করতে হতো! মালেকা বেগমের মতে, 'মুসলিমের মধ্যে একান্ত স্বজনদের সাথে পর্দা আরোপ করা হতো না। হিন্দু সমাজে পর্দা প্রথা নারী ও তার বৈবাহিক সূত্রে পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে সাক্ষাৎ নিষেধ করেছে।' (আমি নারী, পৃ. ৩)।

জনপ্রিয় প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেদের বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে লিখেন, 'মৌলভী বাড়ির মেয়েদের কেউ কোনো দিন দেখেনি, তাদের গলার স্বর পর্যন্ত শোনেনি।' (আমার ছেলেবেলা, হুমায়ুন আহমেদ, পৃ. ৪৪)।

পূর্বসূরিদের রক্ত দেহে ধারণ করেও বাঙালি নারীরা এখন অনেক শিক্ষিত হয়েছে, আধুনিক হয়েছে, স্মার্ট হয়েছে, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছে, এখন তারা পড়শির সঙ্গে ভাববিনিময় করতে শিখেছে, প্রেম, প্রণয় ও পরকীয়া করতে শিখেছে। আর এসবের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে ভারী ও প্রতিবন্ধক ভাবছে সেই পূর্বসূরিদের পোশাককে। তাই তারা ধীরে ধীরে নিজ পোশাককে টুকরো টুকরো করে নগ্নতার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু নগ্নতা ও বস্ত্রহীনতা মানেই কি আধুনিকতা? অর্থনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা ড. জিনিয়া জাহিদের মতে, 'আধুনিকতার নগ্ন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নারীরাই নিজেদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। নগ্নতা আর যৌনতাই যদি হয় নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের মাপকাঠি, তাহলে আমাদের নারীদের পুনরায় ভেবে

দেখতে হবে। আসলেই আমরা কেমন স্বাধীনতা চাই।' (ড. জিনিয়া জাহিদের কলাম, নগ্ন মডেল, একজন তসলিমা ও নারী স্বাধীনতা, বাংলা নিউজ টোয়ান্টিফোর ডটকম : ৯/৩/১৪ ইং)।

আসলে নগ্নতাই যদি সভ্যতা ও আধুনিকতা হয়, তাহলে আদিম প্রস্তরযুগের গুহাবাসীদের অসভ্য, বর্বর ও অনাধুনিক বলার যুক্তি নেই। কারণ তারা আরো বেশি বস্ত্রহীন ছিল। বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া নারীর পোশাক কেমন হওয়া চাই, এ বিষয়ে বলেন, 'কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরেজ মহিলাদের প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।' (রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৫৭)। 'বোরকা' প্রবন্ধের সর্বশেষে তিনি বলেন, 'আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা ভগ্নিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।' (রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৬৩)। বাঙালি আধুনিক নারীরা কেবল তাদের রক্তের পূর্বসূরিদের পথ থেকেই সরে যায়নি, তারা তাদের আদর্শের পূর্বসূরি বেগম রোকেয়ার পথ থেকেও বহু দূর সরে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পোশাক ভাবনা : কিছু প্রস্তাবনা :

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আধুনিক শিক্ষিত ও রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতাধর হয়েও মোটামুটি শালীন পোশাক পরিধান করেন, এটা সবাই অবগত। তাই আমরা দেখতে পাই, হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফী সাহেব (দা.বা.) অতি আধুনিক নারীদের উচ্ছৃঙ্খল পোশাক ও জীবনাচার সম্পর্কে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চলেন, দেশের নারীদেরও সেভাবে চলতে হবে।' (প্রথম আলো : ১/৫/১৩ ইং)।

কেবল ব্যক্তিগত জীবনাচারেই নয়, স্যুট-টাই বিষয়ে তাঁর দেওয়া বক্তব্যে পোশাক বিষয়ে তাঁর মাঝে এ দেশীয় মনোভাব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিক্ত হলেও সত্য যে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও তাদের প্রণীত কারিকুলামে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলস্বরূপ বাঙালিকে এখন বাঙালি হিসেবে ঠাওর করা খুবই কঠিন। তাই তো দেখা গেছে, মন্ত্রিসভার পরের বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ স্যুট-টাই পরিহার করে উপস্থিত হলেও পাশ্চাত্যের শার্ট-প্যান্ট নিয়েই এসেছেন। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চুপ থাকায় যদিও এ ক্ষেত্রে তাঁর দ্বৈতনীতি প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাঙালির জীবনাচার এতই বদলে গেছে যে, অন্তত এতটুকু ছাড় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আসলে আরো বেদনাদায়ক সত্য হলো, আমাদের কোনো জাতীয় পোশাক নীতিমালা নেই। শত শত বছর ধরে সাধারণ বাঙালি মুসলমান লুঙ্গি ও ফতুয়া পরেছে। কালের পরিবর্তনে একসময় তারা ফতুয়ার নিচে গেঞ্জি পরতে শুরু করে। উচ্চবিত্তের মুসলিমরা পাঞ্জাবি, পায়জামা ও মাথায় এক ধরনের টুপি (কিস্তি বা তুর্কি টুপি) পরত। বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা শেরওয়ানি পরিধান করত। মেয়েরা শাড়ি দিয়ে গোটা শরীর ঢেকে রাখত। ব্লাউজ ও পেটিকোটের তখনও প্রচলন হয়নি। মুসলমানদের আগমনের পর তারা ব্লাউজ ও পেটিকোট পরতে শুরু করে। হিন্দুরা মুসলমানদের পোশাক গ্রহণ করেনি। তাই হাজার বছরের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি একও নয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মালকোচা (লজ্জা স্থান ঢাকার পোশাক) পরত। তারা শীতকালে গায়ে চটের ছালা পরত আর বারো মাস খালি গায়ে থাকত। সাধারণ হিন্দুরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরত আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা লুঙ্গি বা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরত। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবি, পায়জামা ও মুজিব কোট পরতেন। তখন এটাই ছিল আমাদের জাতীয় পোশাক। মোশতাক সরকার ক্ষমতায় এসে মুজিব কোট বাদ দিয়ে পাঞ্জাবি, পায়জামা, শেরওয়ানি ও তুর্কি টুপি পরার বিধান জারি করেছে। এ দেশের জাতীয় পোশাক হিসেবে এখনও উইকিপিডিয়ায় লেখা আছে, 'পুরুষদের জন্য পায়জামা, লুঙ্গি, কোর্তা, পাঞ্জাবি। নারীদের জন্য শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ।' দেখুন- http://en.wikipedia.org/wiki/ national castume# south_Asia _Bangladesh)

২০০৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি স্যুট-টাই না পরতে নির্দেশনা জারি করেছে। (বাংলাদেশ প্রতিদিন : ৬/৪/১৫ ইং)

এ ছাড়া কর্মচারীদের জন্য অফিসে জিন্স পরে না আসার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সার্বিকভাবে আমাদের জাতীয় কোনো ড্রেস কোড নেই। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা মনে করি– মুসলমানিত্ব ও দেশাত্মবোধের সমন্বয়ে একটি জাতীয় পোশাক নীতিমালা হতে পারে। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে পাশ্চাত্য ও বিজাতীর কালচার অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নারীদের জন্যও শালীন পোশাকের বিধান জারি করা যেতে পারে। সর্বোপরি পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে মুসলমানিত্ব ও দেশাত্মবোধ রক্ষার্থে উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যায়।

উল্লিখিত কাজগুলো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৪

রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের বর্ণনা :

আপনারা যেহেতু পূর্বেই জনসাধারণকে বুখারী শরীফ এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর নাম মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন এখন তাদের সামনে বুখারী শরীফ খুলে ধরুন। যে পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার পর রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, ওই পৃষ্ঠায় তাশাহহুদের বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা আছে এবং হযরত আবু হুরাইয়া (রা.)-এর বর্ণনা উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি নামাযে কেবল তাকবীরাতে ইনতেকালিয়া বলতেন, কিন্তু রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। শেষে এই নামায সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন–

هكذا كانت صلاة رسول الله ﷺ حتى فارق الدنيا

অর্থাৎ রাসূল (সা.) আমৃত্যু এভাবেই নামায আদায় করতেন। এখন যদি আপনি কেবল বুখারী শরীফ নিয়েই ফয়সালা করতে চান, কিভাবে করবেন? বুখারী শরীফে রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে যেমন দলিল-প্রমাণ আছে, তদ্রূপ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার পক্ষেও মজবুত দলিল রয়েছে। হযরত আবু সাঈদের বর্ণনা বুখারী শরীফে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন লা-মাযহাবীরা সমস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠবে, এর বিস্তারিত বর্ণনা নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফে রয়েছে এবং সেখানে কয়েকবার রফয়ে ইয়াদাইন করার কথাও বিবৃত হয়েছে। এখন জনসাধারণকে বলুন যে, এই দুই হাদীস উল্লেখ করার মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, নামাযে বারবার রফয়ে ইয়াদাইন বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। অন্যথায় তিনি যদি বারবার রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা হতেন অবশ্যই হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি বাদ দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনাটি উল্লেখ করতেন। যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, নামাযে বারবার রফয়ে ইয়াদাইন না করার বিষয়টি প্রমাণিত করা, তাই তিনি বিস্তারিত বর্ণনাটি বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির মূল পাঠ দেখুন–

عن سعيد بن الحارث قال صلى بنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله ﷺ

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস, একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রথমে হাদীসটি দেখুন–

باب رفع اليدين فى التكبيرة الاولى مع الافتتاح ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك فى السجود

এই হাদীসে কিন্তু তৃতীয় রাক'আতে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ নেই। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুন, ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসটি স্বীয় শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা থেকে, তিনি ইমাম মালেক থেকে, ইমাম মালেক তাঁর উস্তাদ ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এদিকে একই হাদীস একই সূত্রে ইমাম মালেক (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তা মালিকের বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তা মালিকে বর্ণনাটি দেখুন–

حدثنى يحى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك فى السجود

একটু খেয়াল করুন, ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার উৎস মুয়াত্তা মালেক। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসটিতে দুটি পরিবর্তন করেছেন। প্রথমত, মুয়াত্তার বর্ণনায় আছে–

كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه

(মাজির সীগা) ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, كان يرفع يديه (মুজারের সীগা দিয়ে)। দ্বিতীয়ত, মুয়াত্তার বর্ণনায় রুকুতে যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের কোনো আলোচনায় নেই। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) সেখানে واذا كبر للركوع পরিবর্তন করেছেন। এখন যে প্রশ্নটি সামনে আসবে, তা হলো, মাজির সীগাকে মুজারে দিয়ে পরিবর্তন করেছেন কে? ইমাম বুখারী নাকি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ? واذا كبر للركوع এই বাক্যটি কে সংযোজন করেছেন?

হাদীসটির এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা যদি বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নিই, তবুও লা-মাযহাবীরা তৃতীয় রাক'আতের

শুরুতে অথবা প্রত্যেক রাক'আতের প্রারম্ভে যে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকে তার পক্ষে কোনো প্রমাণ এই হাদীসে নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল :

এতক্ষণ আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর নাম মুখস্থ হওয়ার কথা। আপনি বলুন, আপনারা অনুমতি দিলে রফয়ে ইয়াদাইনের যে মূল বর্ণনাকারী, তার কর্মপদ্ধতি কী ছিল, তা একটু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে ইমাম ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন–

حدثنا ابوبكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال مارايت ابن عمر يرفع يديه الا فى اول ما يفتتح۔

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা.) কে নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো সময় হাত তুলতে দেখিনি। (ইবনে আবী শাইবা ১/২৩৭, হা. ২৪৬৬, জাওহারুন নাকী কিতাবে এ সনদটিকে সহীহ বলা হয়েছে ৩/৭৩)

হাদীসটি পড়ার সাথে সাথে লা-মাযহাবীদের গাত্রদাহ আরম্ভ হবে। তারা বলবে, আমরা বুখারী ছাড়া অন্য কিছু মানি না। আপনি তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিন। আমি যদি এসব বর্ণনাকারীকে বুখারীতে দেখাতে পারি, তাহলে তোমরা মানবে কি না? বুখারী শরীফে ইমাম মুজাহিদের আলোচনা অগণিত বার এসেছে। বিশেষত তাফসীর অধ্যায়ের একটি বর্ণনা দেখান, যেখানে ইবনে আইয়াশ এবং হোসাইনের আলোচনা আছে।

حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر يعنى ابن عياش عن حصين.

(বুখারী ২/৪১৮, হা. ৪৮৮৮)

বোঝা গেল, ওই হাদীসের সব রাবীই বুখারী শরীফের রাবী। ইমাম বুখারী এসব রাবী থেকে বর্ণনা করলে হাদীস সহীহ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এদের থেকে ইমাম ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করলে ভুল কেন হয়ে যাবে? فما ذا بعد الحق الا الضلال

দেখুন, যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা লা-মাযহাবী সুহৃদরা দলিল দিচ্ছেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা তাঁর বছরের পর বছরের আমল বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নামাযের শুরুতে ছাড়া অন্য কোথাও হাত তুলতেন না। চিন্তা করুন, কোনো সাহাবী রাসূল (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করার পর নিজেই কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন? কখনোই না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, নামাযের ভেতরে বারবার হাত তোলার বিধানটি মূলত মদীনা শরীফ আসার পর রহিত হয়ে গিয়েছিল। যেমনটি নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকেও প্রতিভাত হয়–

قال ابن عمر كنا مع رسول الله ﷺ نرفع ايدينا فى بدء الصلاة وفى داخل الصلاة عند الصلاة فلما هاجر النبى عليه السلام ترك رفع اليدين فى داخل الصلاة عند الركوع وثبت على رفع اليدين فى بدء الصلاة

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে মক্কায় থাকাকালীন নামাযের শুরুতে এবং নামাযের ভেতরে রুকুর সময় হাত উঠাতাম, তারপর রাসূল (সা.) যখন হিজরত করে মদীনা চলে এলেন, তখন নামাযের মধ্যে রুকুর সময় হাত উঠানো বন্ধ করে দিলেন। শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠানো অব্যাহত রাখলেন। (আখবারুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন লিল কাইরুনী, পৃ. ২১৪, হা. ৩৭৮)

আমরা কেন নামাযে বারবার হাত উত্তোলন করি না?

কারণ একাধিক সহীহ হাদীস, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত যারা রফয়ে ইয়াদাইনের রাবী, তাদের ও সালফে সালেহীনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এ কথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নাত। এ ছাড়া রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়। যেমন, সিজদায়ে সাহুর সময়, দুই সিজদার মাঝে এবং প্রত্যেক ওঠানামার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়। নিম্নে আমাদের পক্ষে কয়েকটি সহীহ হাদীস ও আছার উল্লেখ করা হলো–

প্রথম দলিল নবী (সা.)-এর নামায :

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلاة رسول الله ﷺ فصلى فلم يرفع يديه الا فى اول مرة۔

আলকামা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল (সা.)-এর নামাযের মতো নামায আদায় করব না? এ কথা বলে তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছিলেন। (তিরমিযী হা. ২৫৭, আবু দাউদ ৭৪৮, নাসাঈ ১০৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২৪৫৬, মুসনাদে আহমদ হা. ১/৩৮৮)

মুহাদ্দিস আহমদ শাকির এ হাদীস সম্পর্কে বলেন,

هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوه فى تعليله ليس بعلة۔

ইবনে হাযম ও অন্যান্য হাফিজুল হাদীস এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কেউ কেউ এর বর্ণনাগত যে ত্রুটি আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুত সেগুলো ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত নয়। (আহমদ শাকির কর্তৃক তাহকীককৃত তিরমিযী ২/৪১)

আল্লামা ইবনুত তুরকমানী (রহ.) বলেন,

رجاله رجال مسلم.

এই হাদীসের সকল রাবী সহীহ মুসলিমের রাবী। (জাওহারুন নাকী ২/৭৮)

দ্বিতীয় দলিল : রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে হাদীসের বারণ :

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, একদিন রাসূল (সা.) আমাদের কাছে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন,

مالى اراكم رافعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة

কী ব্যাপার? আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি যেন তা বেয়াড়া ঘোড়ার ঊর্ধ্বে উত্থিত লেজ! তোমরা নামাযে স্থির থাকবে। (সহীহ মুসলিম হা. ৪৩০) এ হাদীসে রাসূল (সা.) স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। আর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ীই যেহেতু রফয়ে ইয়াদাইন স্থিরতা পরিপন্থী তাই আমাদের কর্তব্য হলো, নবী (সা.)-এর নির্দেশ মতো স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়া।

তৃতীয় দলিল :

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

ان النبى ﷺ كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود.

রাসূল (সা.) নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন, এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না। (আবু দাউদ হা. ৭৫২, ইবনে আবী শাইবা হা. ২৪৫৫, দারাকুতনী হা. ২২)

চতুর্থ দলিল :

হযরত ওমর (রা.)-এর আমল :

আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه فى اول تكبيرة ثم لايعود

আমি হযরত ওমর (রা.) কে দেখেছি, তিনি শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, পরে করতেন না। (তহাবী ১/১৬৪)

আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা আসকালানী (রহ.) এই বর্ণনার সকল রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (দিরায়াহ ১/১৫২)

জাওহারুন নাকী গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের সনদের মতো শক্তিশালী। (জাওহারুন নাকী ২/৭৫)

পঞ্চম দলিল :

খোলাফায়ে রাশেদীন ও রফয়ে ইয়াদাইন :

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা নীমাভী (রহ.) খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারাবিষয়ক বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,

واما الخلفاء الاربعة فلم يثبت عنهم رفع الايدى فى غير تكبيرة الاحرام

খোলাফায়ে রাশেদীন শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। অন্য সময়ে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। (আছারুস সুনান ১/১০৯)

ষষ্ঠ দলিল :

মদীনাবাসী ও রফয়ে ইয়াদাইন :

ইমামে দারুল হিজরাহ ইমাম মালিক (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ৯৩ হিজরীতে। ইলমের অন্যতম কেন্দ্রভূমি মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর জীবন কেটেছে। সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডার তাঁর সামনে ছিল। তিনি শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর কর্মকে বুনিয়াদী বিষয় বলে মনে করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ আল্লামা ইবনুল কাসিম (রহ.) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে তাঁর যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন তা এই,

قال مالك لا اعرف رفع اليدين فى شئ من تكبير الصلاة لا فى خفض ولا فى رفع الا فى افتتاح الصلاة قال ابن القاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا الا فى تكبيرة الاحرام۔

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীরের সময়, নামাযে ঝোঁকার সময় কিংবা সোজা হওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করার নিয়ম আমার জানা নেই। ইবনুল কাসিম (রহ.) আরো বলেন, ইমাম মালিক নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রফয়ে ইয়াদাইন করার পদ্ধতিকে (দলিলের বিবেচনায়) দুর্বল মনে করতেন। (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৭১)

ইবনে ওমর (রা.) এবং রফয়ে ইয়াদাইন :

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বারবার রফয়ে ইয়াদাইনের কথা বর্ণিত আছে। আর মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে হযরত ইবনে ওমরের আমল বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাযে শুধু প্রথমবার হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর করতেন না। দেখুন, হযরত ইবনে ওমরের বর্ণনা আর তাঁর নিজের আমলের মাঝে বাহ্যত সংঘর্ষ হয়ে গেল। এখন কোনটা অনুযায়ী আমল করা হবে? মূলনীতি অনুযায়ী সংঘর্ষের কারণে কোনো হাদীস অনুযায়ীই আমল করা হবে না। বরং এ সম্পর্কে অন্য কোনো বর্ণনা আছে কি না? তা দেখতে হবে।

আমরা যখন হাদীস শরীফের অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করি, তখন দেখতে পাই যে, মুসনাদে হুমাইদী নামক হাদীসের গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে একটি বিশুদ্ধ মারূফ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। মূলত মুসনাদে হুমাইদী হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। শায়খ আজমীর প্রচেষ্টায় তা প্রকাশিত হলেও মুসনাদে হুমাইদীর কপিটি ছিল মূলত লা-মাযহাবীদের মান্যবর পুরোধা শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নজির হোসাইন দেহলভীর বর্ণনাকৃত নোসখা। যা তাঁর দুজন ছাত্র তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছে। আমি এ কথা এ জন্য বলছি যে, লা-মাযহাবীরা ওই সহীহ হাদীসের উত্তর দিতে না পেরে বলে বেড়ায়, এটি দেওবন্দি নোসখায় রয়েছে। অন্য কোনো নোসখায় এই হাদীস নেই। অথচ এই

মাত্র আমি বললাম, এটি কোনো দেওবন্দি নোসখা নয়, বরং মিয়া নজির হোসাইন কর্তৃক বর্ণনাকৃত নোসখা।

হাদীসটি দেখুন–

حدثنا الحميدى قال حدثنا الزهرى قال اخبرنى سالم بن عبد الله عن ابيه قال رأيت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين۔

অর্থ, রাসূল (সা.) নামাযের সূচনাতে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। তবে রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় এবং উভয় সিজদার মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না। (মুসনাদে হুমাইদী, হা. ৬১৪)

এই হাদীসটি শুধু মুসনাদে হুমায়দীতে আছে, তা নয় বরং তা মুসনাদে আবী আওয়ানাতে বর্ণিত হয়েছে। ৩৭ নম্বর পরিচ্ছদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন–

حدثنا عبد الله بن ايوب المخزومى وسعدان بن نصر و شبيب بن عمرو فى آخرين قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله ﷺ اذ اافتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين۔

.

অর্থ : পূর্বের মতোই। (মুসনাদে আবী আওয়ানা, হা. ১৫৭২) যাঁরা নিজেদের সহীহ হাদীসের ওপর আমলকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন, তাঁদেরকে বলব, রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে সাংঘর্ষিক হাদীসগুলো পরিহার করে এই সহীহ, মরফূ হাদীসগুলো গ্রহণ করুন।

রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের কিছু গোয়েবলসীয় অপপ্রচার :

লা-মাযহাবীরা সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার জন্য দাবি করে থাকে যে, বারবার হাত তোলার হাদীস চার খলীফাসহ ২৫ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে এবং তাদের হিসাব মতে বারবার হাত তোলার হাদীসের রাবীর সংখ্যা নাকি ৫০ জন এবং এ ব্যাপারে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা একত্র করলে তার সংখ্যা হবে নাকি ৪০০। তাদের এ দাবিগুলো নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং গোয়েবলসীয় অপপ্রচার বৈ কিছু নয়। নিম্নে তাদের এই ভিত্তিহীন দাবির পর্যালোচনা করা হলো–

ক. তারা চার খলীফা সম্পর্কে দাবি করল যে, তাঁরা সকলেই নামাযের মধ্যে বারবার হাত তুলতেন। অথচ একটু পূর্বে আমরা দলিলসহ প্রমাণ করে এসেছি যে, চার খলীফার কেউ রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। কাজেই তাদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. তারা ৫০ জন রাবী বা সাহাবীর ব্যাপারে দাবি করেছেন যে, তাঁরা সবাই বারবার হাত তুলতেন, তাদের এ দাবিও সম্পূর্ণ ভুল। মদীনাবাসী কোনো সাহাবীই বারবার হাত তুলতেন না। আর কুফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ ১৫০০ সাহাবা বসবাস করতেন, তাঁদের কেউ রুকু-সিজদার সময় হাত তুলতেন না। তাহলে তাদের এই ৫০ জন সাহাবী কারা ছিলেন? লা-মাযহাবীদের মান্যবর পুরোধা ইমাম শাওকানী (রহ.) লিখেছেন যে আল্লামা ইরাকী (রহ.) নামাযের শুরুতে হাত তোলার বর্ণনাকারী সাহাবাদের সংখ্যা গণনা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা হলো ৫০ জন। তাঁদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবাও রয়েছেন। এই একই কথা সানআনী (রহ.) সুবুলুস সালাম, শরহু বুলুগিল মারাম ১/২৭৪) গ্রন্থেও বলেছেন।

এর দ্বারা লা-মাযহাবীদের শঠতা এবং প্রবঞ্চনা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়ে গেল যে, ৫০ জন সাহাবা যে হাত তোলার বর্ণনা করেছেন, তা শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত তোলার ব্যাপারে। নামাযের ভেতরে রুকু-সিজদার সময় হাত তোলার বর্ণনা তাঁরা করেননি। লা-মাযহাবীদেরই মহান পুরোধার মুখ থেকেই তা ফুটে উঠেছে। এর পরও কোন মুখে তারা এ দাবি করে যে, ৫০ জন সাহাবী থেকে রুকু-সিজদার সময় হাত তোলার প্রমাণ আছে? এটা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন ও প্রতারণামূলক একটি দাবিমাত্র।

গ. তাদের তৃতীয় দাবির রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে মোট হাদীসের সংখ্যা ৪০০। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে ১৪০০ বছরের মধ্যে তারা এ ৪০০ হাদীস একত্র করে হাদীসের একটা সংকলন বের করল না কেন? তাদেরকে আরো সময় প্রদান করা হলো, তারা উক্ত ৪০০ হাদীসের সমন্বয়ে একটি পেল্লাই সাইজের গ্রন্থ রচনা করে উম্মাহর সামনে পেশ করুক। যাতে উম্মাহ দেখতে পারে, আদৌ ৪০০ হাদীস আছে কি না? না কেবল শুভঙ্করের ফাঁকি? বা থাকলে সেগুলোর হালত কী? আর যে দু-চারটি হাদীস তারা উপস্থাপন করবে, তাও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কারণ লা-মাযহাবী সুহৃদদের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ শাকির (রহ.) একটা চমৎকার, বাস্তবধর্মী মন্তব্য করেছেন। তাতে লা-মাযহাবীদের স্বরূপ অনিন্দ্যসুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, রফয়ে ইয়াদাইনের বিষয়ে এক শ্রেণির লোক দুর্বল হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াসে আদাজল খেয়ে নামে, তাদের অধিকাংশ লোকেরা নীতি-নৈতিকতা ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকে। (জামে তিরমিযী, তাহকীক, আহমদ শাকির ২/৪২)

প্রিয় পাঠক! রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে অনেক নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেল।

এখন তারাবীর রাক'আত সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেই সেমিনারের যবনিকাপাত টানব ইনশাআল্লাহ...

তারাবীর নামায :

তারাবীর নামায ২০ রাক'আত না আট রাক'আত–এ বিষয়ে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ১২৮৫ হিজরী পর্যন্ত কোনো বিতর্কই ছিল না। বরং সমগ্র উম্মাহ এক বাক্যে ২০ রাক'আত তারাবীর সুন্নাত হওয়ার প্রবক্তা ছিল। কিন্তু সর্বপ্রথম ১২৮৫ হিজরীতে প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আলেম মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী এই ফাতওয়া প্রচার করেন যে, আট রাক'আত তারাবী পড়া সুন্নাত, আর ২০ রাক'আত পড়া বিদআত। তার এই দাবিটি অবাস্তব এবং কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোথাও ২০ রাক'আতের কম তারাবী পড়ার ইতিহাস নেই। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আমরা শুধু তারাবী নামায ২০ রাক'আত হওয়ার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করব।

রাসূল (সা.) ২০ রাক'আত তারাবী পড়েছেন :

عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر

ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) রমাজান মাসে ২০ রাক'আত তারাবী ও বিতর পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৪, হা. ৭৭৭৪)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে তারাবীর নামায :

প্রথম খলীফার যুগে সবাই নিজেদের মতো তারাবীর নামায পড়তেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তারাবী :

রমাজানের প্রতি রাতে ইশার পর বিতরের পূর্বে জামা'আত সহকারে তারাবী পড়ার এবং তাতে কোরআন খতম করার ধারাবাহিকতা হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে আরম্ভ হয়। সে সময় তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাক'আত নামায উপরোক্ত নিয়মেই আদায় করেছেন এবং এ বিষয়ে কারও দ্বিমতও ছিল না। সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের আমলও এরূপ ছিল। অদ্যাবধি হারামাইন শরীফাইনে এই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

ইয়াযীদ ইবনে রুমান বলেন,

كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة.

অর্থ : হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম রমাজানে ২৩ রাক'আত নামায আদায় করতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

ইমাম বায়হাকী কিতাবুল মারিফায় প্রখ্যাত সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন,

كنا نقوم فى زمن عمر بن الخطاب يعشرين ركعة والوتر

আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ২০ রাক'আত তারাবী ও বিতর পড়তাম। (আস সুনানুল কুবরা ১/২৬৭২৬৮, সনদ সহীহ নাসবুর রা'য়াহ ২/১৫৪)

আরেক বর্ণনায় তিনি বলেন,

كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة.

আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ফজরের কাছাকাছি সময়ে তারাবীর নামায থেকে ফিরতাম। আর হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তারাবী হতো (বিতরসহ) ২৩ রাক'আত। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪/২৬১, ৭৭৩৩ (সনদ নির্ভরযোগ্য) প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবুল আলিয়া স্বীয় উস্তাদ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত ওমর (রা.) হযরত উবাই (রা.) কে রমাজানে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেন এবং বললেন, লোকজন দিনভর রোযা রাখে, কিন্তু তারা সুন্দরভাবে কোরআন পড়তে পারে না, তাই আপনি যদি রাতে তাদেরকে নামাযে কোরআন পড়ে শোনাতেন! তখন তিনি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! জামা'আতবদ্ধ হয়ে কোরআন পড়ার এ নিয়ম তো পূর্বে ছিল না। তিনি বললেন, আমি জানি, তবে তা খুবই উত্তম। এরপর সাহাবী উবাই (রা.) লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাক'আত পড়লেন। (আল মুখতারাহ জিয়াউদ্দীন মাকদিসী ৩/৩৬৭, ১১৬১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রা.)-এর গবেষণা :

লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেন,

فلما جمعهم عمر على ابى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث.

যখন হযরত ওমর (রা.) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পেছনে একত্র করে দিলেন তখন তিনি ২০ রাক'আত তারাবী ও তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। (আল ফাতাওয়াল মিসরিয়্যা ২/৪০১)

তিনি আরো লিখেন,

فرأى كثير من العلماء ان ذلك (عشرين ركعة) هو السنة لانه اقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره.

অসংখ্য আলেম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এটিই সুন্নাত। কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) মুহাজির ও আনসারদেরকে ২০ রাক'আত তারাবী পড়িয়েছেন। আর কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩)

হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে তারাবী :

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগেও তারাবীর নামায ২০ রাক'আত

পড়া হতো।

সাইব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তাঁরা লাঠিতে ভর দিতেন। (সুনানে বায়হাকী ২/৪৯৬)

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল :

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু আব্দুর রহমান বলেন, হযরত আলী (রা.) রমাজান মাসে কারীদেরকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবী পড়েন। আর স্বয়ং আলী (রা.) বিতর পড়াতেন। (বায়হাকী ২/৪৯৬)

প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল :

প্রখ্যাত তাবেঈ আ'মাশ (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ২০ রাক'আত তারাবী এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। (কিয়ামুল লায়ল ১৫৭)

ইজমায়ে উম্মতের আলোকে তারাবীর নামায :

২০ রাক'আত তারাবী রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। বিশেষত হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ আরব-আজম তথা সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের নিকট এ বিষয়টা ব্যাপক ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কয়েকটি অনির্ভরযোগ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানরা ২০

রাক'আত তারাবী পড়ে থাকে। বরং এতে সব মুহাজির আনসার সাহাবী এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য সংঘটিত হয়। যার বিপরীতে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্য সাহাবীর কোনো ধরনের আপত্তি কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই।

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত তাবেঈ আতা ইবনে আবী রবাহ (রহ.) বলেন,

ادركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة والوتر ثلاث ركعات۔

আমি সাহাবায়ে কেরামকে রমাজান মাসে ২০ রাক'আত তারাবী পড়তে এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তে দেখেছি। (কিয়ামুল লাইল ৫৭)

বুখারী শরীফের খ্যাতিমান ভাষ্যকার ইমাম কাসতালানী (রহ.) লিখেছেন,

وقد عدوا ما وقع فى زمن عمر كالاجماع

হযরত ওমর (রা.)-এর যুগের অবস্থা প্রায় ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য পর্যায়ে গণ্য। (ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী ৩/৪২৬)

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন,

اجمع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة۔

তারাবীর নামায ২০ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। (মিরকাত শরহে মিশকাত ৩/৩৪৬)

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ আল মুগনীতে লিখেন,

انه ما فعله عمر واجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فى عصرهم احق واولى بالاتباع

হযরত ওমর (রা.) যা করেছেন এবং যে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের যুগে ইজমা তথা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, অনুসরণের ক্ষেত্রে তাই গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। (আল মুগনী ১/১৬৭)

মক্কা-মুকাররমায় তারাবী :

রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের যুগ থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে ২০ রাক'আত তারাবীর নিয়ম আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে আসছে। কোনো যুগে এর ব্যত্যয় ঘটেছে, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় নেই।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন,

واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى ﷺ عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وقال الشافعىؒ وهكذا ادركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة۔

(তারাবীর রাক'আত সংখ্যা বিষয়ে) অধিকাংশ মনীষী ওই মতই পোষণ করেন, যা আলী (রা.), হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ২০ রাক'আত। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও তাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি মক্কাবাসীকে ২০ রাক'আত তারাবী পড়তে দেখেছি। (জামে তিরমিযী শরীফ ১/১৬৬)

মদীনা মুনাওয়ারায় তারাবী :

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই (রহ.) বর্ণনা করেন,

كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) রমাজান মাসে লোকদের নিয়ে মদীনাতে ২০ রাক'আত তারাবী এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩, ৭৭৬৬)

মোট কথা, ১৫০০ বছরের ইতিহাসে মদীনা শরীফে ২০ রাক'আতের কম তারাবীর নামায কেউ পড়েননি।

শায়খ আতিয়্যাহ সালিম মাদানী (রহ.)-এর অভিমত :

আরব বিশ্বের কীর্তিমান স্কলার, মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের স্বনামধন্য উস্তাদ, মদীনা শরীফের অন্যতম বিচারপতি শায়খ আতিয়্যা সালিম আরবী ভাষায় আত তারাবীহ আকছারা মিন আলফি আম (التراويح اكثر من الف عام) নামে

একটি কিতাব রচনা করেছেন। যাতে তিনি প্রতি শতাব্দীতে তারাবীর বিশদ ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

হিজরী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তারাবী :

প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস এতক্ষণের আলোচনায় এসে গেছে, যার সারকথা এই যে, খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগে এবং তার পরও সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাক'আত তারাবী পড়েছেন। (এর কম পড়েছেন, ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই) বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু অতি উৎসাহী লোক ৩৬ রাক'আত তারাবী এবং তিন রাক'আত বিতর মিলে ৩৯ রাক'আত পর্যন্ত পড়েছেন। (আত তারাবীহ আকছারা মিন আলফি আম, পৃ. ৪১)

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী :

এই তিন শতাব্দীতে ৩৬-এর পরিবর্তে পুনরায় ২০ রাক'আত তারাবী পড়া আরম্ভ হলো। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪২)

অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী :

প্রথম রাতে যথারীতি ২০ রাক'আত তারাবীর নামায পড়া হতো এবং শেষ রাতে ১৬ রাক'আত নামায আদায় করা হতো। (প্রাগুক্ত-৪৭)

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও অনুরূপ আমল ছিল। (প্রাগুক্ত)

চতুর্দশ শতাব্দী :

শায়খ লিখেন :

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায পূর্বের মতোই ছিল। অর্থাৎ প্রথম রাতে ২০ রাক'আত পড়া হতো এবং শেষ রাতে ১৬ রাক'আত।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিষয়ে তিনি লিখেন, এ সময় সৌদি শাসনামলের সূচনা হলো এবং মক্কা-মদীনার পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তারাবীর ব্যবস্থাপনা অধিক সুসংহত করা হলো। এ সময় পুরো রমাজান ইশার পর ২০ রাক'আত তারাবী ও তিন রাক'আত বিতর পড়া হতো।

এভাবে প্রতীয়মান হয়, তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়া ছিল সর্বযুগে চির মীমাংসিত একটি বিষয়। সে জন্য অন্যান্য ভূখণ্ডেও এ নিয়ম চালু ছিল। (প্রাগুক্ত ৪৮, ৬৫)

পঞ্চদশ শতাব্দী :

নামাযে পায়াম্বার (সা.) গ্রন্থের লেখক ডক্টর ইলিয়াস ফয়সাল বলেন, শায়খ আব্দুল আযীয ও আব্দুল মজিদ ২২ সফর ১৪০৫ হিজরী পর্যন্ত হায়াত ছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম চার বছরও তাঁরাই উপরোক্ত নিয়মে তারাবী পড়িয়েছেন। মসজিদে নববীর মতো মক্কা মুকাররমায়ও তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন সকল মুসলমানকে মক্কা-মদীনার মতো ২০ রাক'আত তারাবী পড়ার তাওফিক দান করেন। (নামাযে পায়াম্বার, পৃ. ২৪৮)

দুটি প্রশ্ন :

ওপরের সম্পূর্ণ আলোচনা শেষে শায়খ আতিয়্যা সালিম লিখেন, ওপরের এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর পাঠকের খেদমতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই সুদীর্ঘ ১০০০ (বরং ১৫০০) বছরেরও অধিক সময়ে কখনো কি মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায আট রাক'আত পড়া হয়েছে? কিংবা ২০ রাক'আতের কম পড়া হয়েছে? হয়নি। বরং ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, পুরো ১৪০০ বছর তারাবীর নামায ২০ রাক'আত বা তারও অধিক পড়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনো মুহাজির বা আনসারী সাহাবী কি এই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, তারাবীর নামায আট রাক'আতের চেয়ে বেশি পড়া জায়েয নয়? তাঁদের কেউ কি আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে আট রাক'আত তারাবীর পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন?

যখন এই দীর্ঘ সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও এমন পাওয়া যায় না, যিনি বলেছেন তারাবীর নামায আট রাক'আতের বেশি পড়া জায়েয নয়, আর না মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায আট রাক'আত হওয়ার কোনো প্রমাণ রয়েছে, তার পরও যারা আট রাক'আত নিয়েই অটল হয়ে আছেন এবং অন্যদের সেদিকে আহবান জানাচ্ছেন তাদেরকে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকল মুসলিমের যে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা, তার বিরোধিতা করার চেয়ে অনুসরণ করাই অধিক শ্রেয়। বিশেষত যিনি মসজিদে জামা'আতের সাথে তারাবী পড়তে ইচ্ছুক। (আত তারাবীহ আকছারা মিন আলফি আম ১০৮-১০৯)

একটি আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ, আছে কি কেউ গ্রহণ করার?

এখানে এসে নামাযে পায়াম্বার গ্রন্থের লেখক ড. ইলিয়াস ফয়সাল লা-মাযহাবী ভাইদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাহে রমাজানে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন রহমত বান্দার জন্য অবারিত হয়। এ মাসে এক রাক'আতের সাওয়াব অন্তত সত্তর গুণ হয়ে থাকে। এরপর প্রত্যেকের ইখলাস ও একাগ্রতা অনুযায়ী সাতশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ জন্য এই সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সর্বোচ্চ অর্জনে মনোনিবেশ করা উচিত। এ অমূল্য সময়ে অলসতা করে বা ফেরকাগত সংকীর্ণতার শিকার হয়ে কেউ যদি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পূর্ণ তারাবী না পড়ে আল্লাহর সীমাহীন দান থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তবে সে নিতান্তই মন্দ কপাল। কিয়ামতের দিন বুঝে আসবে, মৃত্যুর পূর্বে অতি সহজেই যা অর্জন করা সম্ভব ছিল তার মূল্য

কত। নিচের নকশা থেকে ২০ রাক'আত তারাবী ও আট রাক'আত তারাবীর সাওয়াবের ন্যূনতম তারতম্য লক্ষ করুন, এরপর নিজের জন্য কোনো একটিকে নির্বাচন করুন।

২০ রাক'আত তারাবী : ২০×৩০=৬০০, ৬০০×৭০=৪২০০০

৮ রাক'আত তারাবী : ৮×৩০=২৪০, ২৪০×৭০-১৬৮০০

তাহলে ২০ রাক'আত তারাবী আদায়কারী মাত্র এক মাসে অন্তত ৪২০০০ রাক'আত নামায পড়ার সাওয়াব পেয়ে থাকেন (বরং এর চেয়েও বেশি) অন্যদিকে ৮ রাক'আত তারাবী আদায়কারীর হিসাবে আসছে ১৬৮০০ রাক'আত নামাযের সাওয়াব। আমাদের কি অধিক সাওয়াব অর্জনের পথ অবলম্বন করা উচিত নয়? (নামাযে পায়াম্বর, পৃ. ২৫০-২৫১)

একটি মাযিরাহ কৈফিয়ত :

সম্মানিত সুধী! তারাবী সম্পর্কে এখানেই শেষ করছি। একটি কৈফিয়ত পেশ করা খুব দরকার মনে করছি। আমরা পূর্বে ওয়াদা করেছিলাম লা-মাযহাবীদের সাথে মতবিরোধপূর্ণ সব মাসআলা নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু সময় স্বল্পতার দরুন মাত্র কয়েকটি মাসআলা নিয়েই আলোচনা করা সম্ভবপর হলো। লা-মাযহাবীদের সাথে মতবিরোধপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বিশেষত বিতরের রাক'আত সংখ্যা, তিন তালাকের বিধান, মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি, ঈদের তাকবীর সংখ্যা, উমরী কাযা নিয়ে আলোচনার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে তা সম্ভব হলো না। পরবর্তীতে কোনো সময় সাক্ষাৎ হলে তা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

সেমিনারের সার নির্যাস :

সেমিনারের মূল বাণীটা শিরোনাম থেকে প্রতিভাত হয়। 'লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও করণীয়'। প্রথমত, আমরা তাদেরকে লা-মাযহাবী নামেই সম্বোধন করব। আহলে হাদীস নামে নয়। দ্বিতীয়ত, তারা বর্তমানে উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা। তৃতীয়ত, তাদের সাথে মতবিরোধের মূল হেতু কী? স্বরূপ কী? শুধু কয়েকটি শাখাগত বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে, না মূল আকিদায় সমস্যা, তাও তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। তাদের সাথে বিতর্ক হলে আমাদের করণীয় কী? কোন পথ ধরে আমাদের এগোনো উচিত? কোন কোন পয়েন্টকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা দরকার? পুরো সেমিনারে জ্ঞানগত দলিল-প্রমাণের চেয়ে এসব বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ ছিল। এসব কৌশলকে পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়ত্ত করে নিলে এ ময়দানে কাজ করা অনেক ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ!

আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর একটি চমৎকার বাণী :

আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমরা পূর্বেও বিশদভাবে আলোচনা করেছি, আমাদের এসব কাজ থেকে উদ্দেশ্য হলো, ইসলাহ তথা সংশোধন এবং সংস্কার করা, ইখতিলাফ তথা মতবিরোধ সৃষ্টি করা নয়। এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর একটি তাৎপর্যময় ও কার্যকরী বাণী আমার স্মরণ হলো। এ বাণী দ্বারা আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তিনি বলতেন, হক কথা হক পন্থায় হক নিয়্যাতে বললে কখনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। তবে শর্ত ওই তিনটিই।

প্রথম শর্ত, কথা হক হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত, নিয়্যাত হক হতে হবে।

তৃতীয় শর্ত, বলার পন্থাও হক হতে হবে।

যদি কোথাও হক কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে গোলযোগ কিংবা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে উল্লিখিত তিনটি শর্তের কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত ছিল। হয়তো কথা হক ছিল না, অথবা কথা তো হক ছিল, কিন্তু নিয়্যাত হক ছিল না। অর্থাৎ কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হয়েছিল, যেমন স্বীয় বড়ত্ব প্রকাশ ও অন্যকে অপদস্থ করার হীনমানসে কথাটা বলা হয়েছিল। তাহলে তো নিয়্যাত সঠিক হলো না। অথবা নিয়্যাত সঠিক ছিল বটে, কিন্তু পন্থা সঠিক ছিল না। যদি হক কথা, হক পন্থা, হক নিয়্যাত–এ তিনের সমন্বয় ঘটত, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। ত্বরিত কিংবা বিলম্বে একসময় প্রভাব সৃষ্টি করতই।

সম্মানিত সুধী!

এ সেমিনারে যা কিছু বলা হলো তন্মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করুক। সঠিক কথাগুলো অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। যাঁরা এই নুরানী সেমিনারের আয়োজন করেছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইহকাল-পরকালে সর্বতোভাবে সফল করুন। বিশেষত ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) কে আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘ সুস্থ এবং সুখী জীবন দান করুন। তাঁর বরকতময় হায়াতকে উম্মতের জন্য দীর্ঘ করে দিন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

সমাপ্ত

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৩

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

ইমামগণ হয়তো হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হলো, চার ইমামের যুগে হাদীসের সংকলন চলছিল, এ জন্য হয়তো তাঁদের নিকট সংশ্লিষ্ট হাদীসটি পৌঁছেনি।

এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

"চার ইমামের যুগে হাদীসের সংকলন চলছিল। সুতরাং সম্ভবত হয়তো হাদীসটি ইমামের নিকট পৌঁছেনি। তিনি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।"

The process of compilation of the Hadith was going on

এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, এক ব্যক্তির পক্ষে রাসূলের (সা.)-এর সমস্ত হাদীস সংগ্রহ করা কিংবা সেগুলো আয়ত্ত করা অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন,

مَنْ إعتقد أَنَّ كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأيمة، أو إماما معينا :فهو مخطىء خطأ فاحشا قبيحا

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, সমস্ত সহীহ হাদীস সকল ইমামের নিকট পৌঁছেছে কিংবা কোনো একজন ইমামের নিকট পৌঁছেছে, তবে সে সুস্পষ্ট ও নিকৃষ্টজনক ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

غير لايق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا و اتقانا، حتى ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال :من إدعى أن السنة إجتمعت كلها عند رجل واحد :فسق ، ومن قال :إن شيئا منها فات الأمة :فسق

"কোনো ইমামকে এ বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা অনুচিত যে, তিনি সমস্ত হাদীস মুখস্থ ও আয়ত্ত করেছেন। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দাবি করল যে, রাসূলের সমস্ত সুন্নাহ কোনো এক ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত হয়েছে, সে ফাসেক হয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি এ দাবি করল যে, সুন্নাহের কিছু অংশ উম্মতের নিকট পৌঁছেনি সেও ফাসেক হয়ে গেল?

এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীর কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহের পক্ষে সমস্ত হাদীস মুখস্থ বা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

এখন বিষয়টি যদি এমন হয় যে, হয়তো হাদীসটি সংশ্লিষ্ট মাযহাবের ইমামের নিকট পৌঁছেনি, তবে আমরা কিভাবে সে মাযহাব অনুসরণ করতে পারি?

এ প্রশ্নের সমাধান হলো, ইজতেহাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর সমস্ত হাদীস মুখস্থ কিংবা আয়ত্তে থাকা শর্ত নয়। বরং ইজতেহাদের জন্য যে পরিমাণ হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, প্রত্যেক ইমামই সে পরিমাণ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন,

ولا يقولن به قائل :من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا !لأنه إن اشترط فى المجتهد علمه بجميع ما قاله النبى صلى الله عليه و سلم أو فعله فيما يتعلق با الأحكام :فليس فى الأمة على هذا مجتهد ، وإنما غاية العالم : أن يعلم جمهور ذلك و معظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل

"কারও পক্ষে এ দাবি করার কোনো সুযোগ নেই যে, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর সমস্ত হাদীস এবং হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত না হবে, সে ইজতেহাদ করতে পারবে না। কেননা যদি ইজতেহাদের জন্য এ শর্ত করা হয়, তবে উম্মতে মুসলিমার মাঝে একজনও মুজতাহিদ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং মুজতাহিদ আলেমের উদ্দেশ্য থাকবে, সে হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করবে যে, খুব নগণ্যসংখ্যক বিষয় ব্যতীত অধিকাংশই তার নিকট সুস্পষ্ট থাকবে?

আর পৃথিবীর সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, চার ইমামই ইজতেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

চারও মাযহাবের কিতাবসমূহে সামান্য কিছু বিষয় ব্যতীত অধিকাংশ বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.) লিখেছেন, একদা আল্লামা ইবনে খোজাইমা (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হলো,

هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلال و الحرام لم يودعها الشافعى رحمه الله كتابه؟ قال : لا

অর্থাৎ আল্লামা ইবনে খোজাইমা (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কি হালাল-হারামবিষয়ক এমন কোনো সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত আছেন, যা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেননি। তিনি উত্তর দিলেন, না?

অর্থাৎ সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ কিংবা তাঁর ছাত্রগণ সুস্পষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন।

কিন্তু এ বিষয়টিকে মাযহাবের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটা অবান্তর। অথচ বর্তমানে দেখা যায়, অধিকাংশ লা-মাযহাবী বা সালাফী কোনো একটি হাদীসকে কোনো ইমামের বক্তব্যের বিপরীতে পাওয়া মাত্রই এই রায় দিয়ে দেন যে, হয়তো তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যেমন ডা. জাকির নায়েক 'নামাযে আমীন জোরে বলার হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেছেন, হয়তো ইমাম আবু হানীফা হাদীসগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, এ বিষয়টি এতটা প্রসিদ্ধ যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সময়ে রীতিমতো তর্ক-বিতর্কও হয়েছে।

সুতরাং যেকোনো হাদীস পেলেই এ কথা

বলা নিতান্ত বোকামি যে, May the Hadith did not reach the Imam (হয়তো ইমামের নিকট হাদীসটি পৌঁছেনি)। কেননা সুনিশ্চিতভাবে অবগত না হয়ে তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপের নামান্তর।

তবে কোনো হাদীস প্রসঙ্গে যদি ইমাম বলে থাকেন যে, এ সম্পর্কে আমি কোনো হাদীস জানি না, সে ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, তিনি এ সম্পর্কে কোনো হাদীস জানেন না। কিন্তু ইমামের পক্ষ থেকে যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের কোনো উক্তি না পাওয়া যায়, তবে ইমামের সমস্ত কিতাব এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম হাসিল করেছে, তাদের কিতাবগুলো খুঁজে দেখতে হবে, এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম অবগত ছিলেন কি না। যদি সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে এ কথা বলা বিশুদ্ধ যে, ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যেকোনো হাদীস নিজের মতের স্বপক্ষে হলেই সেটা গ্রহণ করে এ কথা বলা যে, হয়তো ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, নিতান্ত মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ বলেছেন, অনেককে দেখা যায়, তারা বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব' হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর 'মুসনাদে' হাদীসটি কয়েকবার উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে অবগত না হয়ে এ দাবি করা যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ইমামের প্রতি সুস্পষ্ট মিথ্যা আরোপের নামান্তর।

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন,

أن النافي عن إمام إطلاعه على هذا الحديث، إنما يرجم بالغيب ، و يتقول على إمام من أئمة المسلمين بغير علم و لا حجة و لا برهان فهل قال له هذا الإمام :إني لم أطلع على هذا الحديث؟!

অর্থাৎ "ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না" এ কথার প্রবক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে না জেনে, অনুমান করে বলে থাকে এবং বড় বড় ইমামদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বানিয়ে বানিয়ে বলে থাকে। তাকে কি ইমাম এ কথা বলেছেন যে, আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নই। সুতরাং যে কারও পক্ষে যেকোনো হাদীস সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন–

الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوى أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية

'হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলনের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পরবর্তীদের তুলনায় রাসূল (সা.) সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা অসংখ্য হাদীস এমন রয়েছে যে, সেটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ ও সহীহ সূত্রে পৌঁছেছে, যা পরবর্তীতে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, অজ্ঞাত কিংবা বিচ্ছিন্ন সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। অথবা হয়তো হাদীসটি আমাদের নিকট একেবারে পৌঁছেনি। সুতরাং তাদের কিতাব ছিল, তাদের অন্তর, যাতে সংকলিত হাদীসের কিতাবের তুলনায় বহুগুণ বেশি হাদীস সংরক্ষিত ছিল। এবং এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার ব্যাপারে কেউই সন্দেহ পোষণ করবে না।

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন–

ولو زعم زاعم أنه تتبع كل التتبع جميع كتب الإمام، فلم يجد فيها هذا الحديث بعينه :لما ساغ له أن ينفى عنه علمه به، ألا ترى لو فتشت عن حديث صحيح في كتابي البخاري و مسلم، فلم تجده فيهما، لا يجوز لك أن تنفى عنهما علمها به و تقول :هذا حديث صحيح لم يعرفه الإمامان العظيمان : البخاري و مسلم؟؟ فما أعظم علمك إذا؟ !و أى إمام أنت!!

"কেউ যদি মনে করে যে, সে ইমামের সমস্ত কিতাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছে এবং সে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি ইমামের কোনো কিতাবে পায়নি, তবে কি সে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারবে যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? যেমন, তুমি কোনো একটি সহীহ হাদীস সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে অনুসন্ধান করলে, অথচ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে পেলে না, তখন তোমার জন্য তাদের হাদীসটি সম্পর্কে অবগত না হওয়ার ফয়সালা দেওয়া জায়েয নয় এবং এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, এই হাদীসটি সহীহ! অথচ বিখ্যাত দুইমুহাদ্দিস তথা বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) দুজনের একজনও হাদীসটি সম্পর্কে জানেন না। তোমার বক্তব্য যদি এমন হয়, তবে তুমিই বা কত বড় বিজ্ঞান ! আর কোন ইমাম...!

কোন মাযহাব সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন–

'একইভাবে বলা যায়, কে সঠিক অথবা কোন মাযহাব সঠিক? হানাফী নাকি শাফেয়ী? একই সাথে দুটি বিপরীত বিষয় কখনও সমান হতে পারে? উত্তর হলো, না।

ডা. জাকির নায়েক এখানে চার মাযহাবের কোনটি সঠিক অথবা কোনটি অধিক সঠিক, সেটা বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের চেক করে দেখতে হবে, কোনটি সঠিক। ডা. সাহেব বলেছেন, 'আমাদের চেক করে দেখতে হবে। তিনি এখানে কাদেরকে চেক করার কথা বলেছেন? আমাদের বলতে ডা. জাকির নায়েক কাদেরকে বুঝিয়েছেন? তিনি নিজে না কি তাঁর শ্রোতা বা দর্শকরা?

১. ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে তো অনেক অমুসলিমও থাকে, তারা চেক করে দেখবে যে, চার মাযহাবের কোনটি সঠিক? চার মাযহাবের কোন মাযহাবে কী কী ভুল আছে?

২. আর যদি ধরে নিই যে, জাকির নায়েকের ওই লেকচারে কোনো অমুসলিম ছিল না, সব মুসলমান ছিল, এখন তিনি যখন তাঁর মুসলমান

শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বলছেন,
We have to check...
'আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে...? এখানে ডা. জাকির নায়েক কাদেরকে দায়িত্ব দিলেন? তিনি কি তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, যারা ফিকাহশাস্ত্র তো দূরে থাক, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না।

শরীয়তের বিষয়ে যারা অজ্ঞ, যাদের ইসলাম ও ইসলামের ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কে একাডেমিক জ্ঞান তো দূরের কথা, মৌলিক কোনো জ্ঞানই নেই, তাদেরকে তিনি এমন ব্যক্তিদের ভুল ধরার দায়িত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা ওই বিষয়ে ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ। আমরা এ দাবি করছি না যে, তাঁরা কোনো ভুল করেননি কিংবা তাঁদের ভুল ছিল না, তাঁরা ভুল করতে পারেন, সেটা ধরাও অন্যায় না, কিন্তু যে কারও ভুল যে কেউ ধরতে পারবে? যার কোনো ধারণা নেই, তাকে ওই বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারীদের ভুল ধরার জন্য বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া কি সমীচীন? বিষয়টি এমন যে, কেউ সায়েন্সের স'টাও জানে না, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হচেছ, তুমি আইনস্টাইনের ভুল বের করো। তুমি নিউটনের ভুল বের করো। তাদের ভুল করাটা অসম্ভব নয় কি? যাকে ভুল বের করতে দেওয়া হলো তাকে এ দায়িত্ব দেওয়াটা যে গুরুতর অন্যায় এ কথা প্রত্যেক বিবেকবানই স্বীকার করতে বাধ্য।

কেউ হয়তো বলতে পারে, ভুল বের করবেন ডা. জাকির নায়েক, আর শ্রোতারা সেটা গ্রহণ করবে। আমাদের নিকট এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ডা. জাকির নায়েক তাকলীদের ঘোর বিরোধী। শরীয়তের কোনো বিষয়ে কারও অনুসরণ করা যাবে না। এখন ডা. জাকির যদি কোনো সিদ্ধান্ত দেন, তবে শ্রোতারা সেটা মানতে যাবে কেন? ইমাম আবু হানিফার দেওয়া ফাতওয়া আর মাসআলা গ্রহণ করতে যদি সমস্যা থাকে, তবে মানুষ জাকির নায়েকের দেওয়া ফাতওয়া আর মাসআলা কোন যুক্তিতে গ্রহণ করবে? ইমাম শাফেয়ীর মতো যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের দেওয়া মাসআলার ওপর আমল করতে যদি সমস্যা থাকে তবে ডা. জাকির নায়েকের কথা মানুষ গ্রহণ করবে কেন? এখানে কি ব্যক্তির অনুসরণ হলো না?

জাকির নায়েক যদি ভুল বের করেন, তবে সেটা তিনি তাঁর লেকচারে বলবেন কেন? কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, ইসলামে কারও মতামত গ্রহণ করা যাবে না। এখন যদি মাযহাবে ভুল বের করতেই হয়, তবে শ্রোতাদের প্রত্যেকেই গবেষণা করে ভুল বের করবে এবং একজনের গবেষণা আরেকজন অনুসরণ করতে পারবে না। কারণ এ ক্ষেত্রেও একজন অপরজনকে তাকলীদ করা হবে।

সায়েন্টিস্টরা ভুল করেন না, তা নয়। সবাই ভুল করে। তবে সায়েন্টিস্টদের ভুল ধরতে কি পলিটিশিয়ানরা যাবেন? নাকি ইকনোমিস্টরা? এ বিষয়টি জ্ঞানের সকল শাখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : খুতবা

মাও. আশরাফ আলী
মৌলভীবাজার আলিয়া মাদরাসা,
সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

জুমু'আর নামাযের খতীব সাহেব জুমু'আর পূর্বে বয়ান করার সময় বা খুতবা পাঠ করার সময় মিম্বারের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে বসতে পারবেন কি না? অনেকে বলেন, সর্বোচ্চ সিঁড়িতে রাসূলে পাক (সা.) বসেছেন, তাই এতে বসা বেআদবী, আবার অনেকে বলেন, ব্যাপারটি এমনি হলে দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসাও বেআদবী হবে, কেননা এতে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) বসেছেন। এ ধরনের বিভিন্ন কথাবার্তা চলতেছে। আমার প্রশ্ন হলো, আসলেই কি মিম্বারের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে বসা বেআদবী?

সমাধান :

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিম্বারের তিনটি সিঁড়ি ছিল। হযরত রাসূলে করীম (সা.) উপরের ধাপে বা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। আবু বকর (রা.) তাঁর খিলাফতের জামানায় দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন এবং হযরত ওমর (রা.) তৃতীয় সিঁড়িতে খুতবা দিতেন। হযরত ওসমান (রা.) দেখলেন যে সিঁড়ি আর অবশিষ্ট নেই এবং সিঁড়ি বৃদ্ধি করে নতুন মিম্বার বানানোর সিস্টেম চালু করলে পরবর্তী উম্মতের জন্য বিরাট ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনি পরবর্তী উম্মতকে এ সমস্যা হতে রক্ষার খাতিরে প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন। অতএব নবী করীম (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণে মিম্বারের যেকোনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার অবকাশ আছে। তাতে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো ধরনের আপত্তি বা বেআদবী হবে বলার অবকাশ নেই। (শামি ৩/৩৯, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৫/১১২)

প্রসঙ্গ : দরূদ

মাও. আতিকুর রহমান
ভবানীপুর, শেরপুর, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

যাঁরা নবী ছিলেন না। যেমন– হযরত খিজির (আ.) এবং মারইয়াম ও হাজেরা তাঁদেরকে 'আলাইহিস সালাম' এবং 'আলাইহাস সালাম' বলার হুকুম কী?

সমাধান :

ফুকাহায়ে কেরামের মতে নবীগণ ও ফেরেশতা ছাড়া অন্যান্য অলি বুজুর্গদের জন্য 'আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম' ব্যবহার করা জায়েয নেই। আবার অনেকেই 'আলাইহিস সালাম' তথা শুধু সালাম শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে সতর্কতাস্বরূপ 'আলাইহিস সালাম'ও ব্যবহার না করা উচিত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৪৮, রুহুল মা'আনি ১২/২৬১)

প্রসঙ্গ : মিরাস

মাও. হাবীবুল্লাহ
আশকোনা, দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক পুরুষ ব্যক্তি মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ হলো পাঁচ কাঠা জমিন। ওয়ারিশ শুধু তার ভাতিজা ও ভাতিজি এবং একজন পালক মেয়ে। উক্ত পুরুষ জীবিত অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাঁচ কাঠা জমিনটি তার পালক মেয়েকে দান করে দিয়েছে। এবং দানপত্র রেজিস্ট্রিও করা আছে এবং পালক মেয়ে সাথে সাথে তা কবজও করে নিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় ভাতিজা ও ভাতিজি ওই পাঁচ কাঠা জমিন থেকে অংশ পাবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের বিধান মতে, ভাতিজা থাকা অবস্থায় ভাতিজি অংশ পায় না। তবে প্রশ্নেবর্ণিত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় সুস্থ ও স্বজ্ঞানে তার সম্পদ পালক মেয়েকে দান করার পর পালক মেয়ে তা কবজ করার কারণে দান সহীহ হয়েছে এবং পালক মেয়ে ওই সম্পদের মালিক সাব্যস্ত হয়েছে বিধায় উক্ত সম্পদ থেকে তার ভাতিজাও মিরাস সূত্রে কোনো অংশ পাবে না। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৪/৪২১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৭৭)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মুহা: ওমর ফারুক লক্ষ্মীপুরী, দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

নিমদাড়ি মুণ্ডানো এবং কাটা বৈধ কি না?

সমাধান :

সহীহ হাদীসের আলোকে এবং ফুকাহায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে নিমদাড়িও দাড়ির অন্তর্ভুক্ত, বিধায় তা ছাঁটা ও কাটা নাজায়েয। (বুখারী ১/৫০১)

প্রসঙ্গ : ব্যবসা

মুহা: হযরত আলী
দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের বাড়ি সীমান্ত এলাকায়। আমরা বিভিন্ন সময় ভারতের সাথে মালামাল আদান-প্রদান করি। আদান-প্রদানের নিয়ম হলো আমাদের এলাকার গার্ডদেরকে ভারতে পাঠিয়ে দিই, তারা ভারত থেকে মাল নিয়ে আসে। তাদেরকে ভারতের সীমানারক্ষীরা কিছু বলে না, তবে বাংলাদেশের সীমানারক্ষীদেরকে কোনো কোনো সময় কিছু টাকা দিতে হয়। যেহেতু আমাদের কাছে সরকার থেকে মাল আদান-প্রদানের নিয়মতান্ত্রিক কোনো অনুমতি নেই। এভাবে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি না? আর সরকার থেকে নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি নিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করলে ব্যবসার লভ্যাংশ হালাল হবে কি না?

সমাধান :

সরকারি আইন লঙ্ঘন করে ঘুষের আশ্রয় নিয়ে বিদেশি জিনিসপত্রের এ ধরনের ব্যবসা গুনাহের কাজ। তবে এ ব্যবসার লভ্যাংশকে হারাম বলা যাবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৯৫)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা: হাবিবুর রহমান
জালালাবাদ, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

রমাজান মাসে তারাবীর নামায পড়া অবস্থায় দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুতে যাওয়ার সময় ইমাম সাহেব কেরাত পড়ে রুকুতে চলে যান তখন তন্দ্রার কারণে আমার রুকু ছুটে যায়। ইমাম সাহেব যখন রুকু থেকে উঠে যান তখন আমি রুকু করি এবং ইমাম সাহেবকে সিজদাতে গিয়ে পাই। এখন আমার নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে কি না?

সমাধান :

তন্দ্রার কারণে ইমামের সাথে রুকু করা ছুটে গেলে জাগ্রত হওয়ার পর উক্ত রুকু আদায়করত ইমাম সাহেবকে সিজদায় গিয়ে পাওয়াতে আপনার নামায শুদ্ধ হয়েছে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৯৫, খায়রুল ফাতাওয়া ২/৪০৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: আব্দুল মুজিব বিন আব্দুল মুকিত
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি এই শর্তে মসজিদের জায়গা ওয়াকফ করতে চায় যে, মসজিদ হবে দ্বিতীয় তলায়, নিচের তলাতে তাকে পরিবার নিয়ে থাকতে দিতে হবে এবং মসজিদের ওপরে দোকান হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তার শর্তের অবস্থান কিরূপ এবং এ ধরনের শর্তসাপেক্ষে তার ওয়াকফকৃত জায়গাতে মসজিদ নির্মাণ করার হুকুম কী?

সমাধান :

নিচতলায় নিজ মালিকানা বহাল থাকার শর্তে ওয়াকফ করা হলে, সেখানে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয় না। তাই দোতলায় নামায আদায় শুদ্ধ হলেও তার ওপর মসজিদে শরয়ীর আহকাম অর্পিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৭/২২৭, রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৭)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা: রাশেদুল ইসলাম
মৌচাক, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের ইমাম সাহেব রোযার মাসে ইশার নামাযে প্রথম রাক'আতে উচ্চস্বরে কেরাত পড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে উচ্চস্বরে কেরাত আদায় না করে বরং সূরা ফাতিহা পড়ার যে সময় লাগে সে পরিমাণ চুপ থেকে এরপর সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করেন এবং অন্য সূরা মিলিয়ে নামায শেষ করেছেন; কিন্তু সাহু সিজদা দেননি। প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় নামায আদায় হয়েছে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইমাম সাহেবের ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় না করায় নামাযের ফরজিয়াত আদায় হলেও ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে ইমাম-মুক্তাদি সবার জন্য ইশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে আগে ইশার নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব ছিল। ইশার নামায আদায় না হওয়ায় সুন্নাত এবং তারাবীও আদায় হয়নি বিধায় ফজরের ওয়াক্তের আগে আগে তাও পুনরায় পড়া আবশ্যক ছিল। তবে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর কোনোটিই আর কাযা করতে হবে না। বিতিরও আদায় হয়ে গেছে। (রদ্দুল মুহতার ২/৬৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ২/১৪৩)

প্রসঙ্গ : আযান

মুহা: আব্দুল কাইয়ুম
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মাইকে আযান দিলে যদি রোগী অথবা শিশুদের ঘুমের ক্ষতি হয় এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের মুসল্লিদের নামায পড়তে সমস্যা হয়। তবে এমতাবস্থায় মাইকে আযান দিতে পারবে কি না?

সমাধান :

আযান হলো ইসলামের অন্যতম শি'আর তথা নিদর্শন, আযান এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে করে দূর-দূরান্তের সকল মুসলমানের নিকট নামাযের দাওয়াত পৌঁছে যায়, আর মাইক হলো তার উত্তম মাধ্যম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ওজরসমূহের

কারণে মাইকে আযান দেওয়া বন্ধ করা যাবে না। তবে প্রয়োজন অতিরিক্ত সাউন্ড না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। (জামিউত তিরমিযী ১/৪৮, বাদায়িউস সানায়া ১/৬৪২)

প্রসঙ্গ : হেবা

মুফতী ফরিদুদ্দীন
হরিরামপুর, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের পিতা জীবদ্দশায় কিছু জমি ক্রয়কালে আমাদের দুই ভাইয়ের নামে সাফকবলা করেন, কিন্তু তাদের ভোগদখলে দেননি। এমতাবস্থায় পিতার মৃত্যুর পর, বর্তমানে ওই জমি সকল ভাই-বোনদের মাঝে বণ্টন হবে, নাকি শুধু ওই দুই ভাইয়ের হক বলে বিবেচিত হবে?

সমাধান :

ভোগদখলে না দিয়ে শুধুমাত্র সাফকবলা করার দ্বারা দুই ভাই উক্ত জমির মালিক হয়নি। বিধায় ওই জমি সমস্ত ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৫৯, হিন্দিয়া ৪/৩৮০, রহিমিয়া ২/১৭৭)

প্রসঙ্গ : যিকির

এম আনোয়ার শাহ
আলীনগর, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামের সিংহভাগ লোক তরিকতের লাইনে 'উজানী ও চরমোনাইকে' অনুসরণ করে বিধায় তারা "ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির করে। ইদানীং কিছু আলেম 'ইল্লাল্লাহ' যিকির করা যাবে না বলে জুমু'আর বয়ান দিচ্ছেন এবং এ বিষয়গুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাধান চাই।

সমাধান :

'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির হক্কানী পীর-মাশায়েখদের দেওয়া প্রসিদ্ধ অজিফা ১২ তাসবীর একটি অংশ। তার পূর্বে যেহেতু لا اله الا الله এর পূর্ণ তাসবীহ পাঠ করা হয়ে থাকে, এবং الا الله এর পূর্বে لا موجود বা لا معبود ইত্যাদির ধ্যানও করা হয় তাই পরবর্তীতে শুধুমাত্র الا الله এর যিকির করতে ভাষাগতভাবে ও শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো সমস্যা নেই। যারা 'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির থেকে মানা করে তারা তরিকতপন্থীও নয় এবং সঠিক শরীয়তপন্থীও নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২২৩, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ১/২৮৩)

প্রসঙ্গ : ওয়াজের বিনিময়

মুফতী মুস্তাকিম আলম
মুগদা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ওয়াজ-নসিহত করে টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয়ে থাকে, তবে চুক্তি করে টাকা নেওয়া বৈধ কি না?

সমাধান :

ওয়াজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকলে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। তবে সময় ও টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। কিন্তু ওয়াজকে এভাবে টাকা কামানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত। এতে ওয়াজের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩০০)

প্রসঙ্গ : স্পিরিট, যাকাত

এ কে এফরান উল্লাহ
দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা-১২১৪।

জিজ্ঞাসা :

(ক) আমি অনেক দিন ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করছি। কিন্তু কিছুদিন আগে জানতে পারলাম এগুলোর সাথে স্পিরিট মেশানো হয়। স্পিরিট সাধারণত বিভিন্ন প্রকার মদ তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুতরাং ওই সব হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া হালাল হবে কি না?

(খ) আমার মা-বাবা যদি যাকাত না দেন তবে কি আমি তাঁদের হয়ে যাকাত দিতে পারব?

সমাধান :

(ক) স্পিরিটমিশ্রিত হোমিও ওষুধ রোগ মুক্তির জন্য সেবনের অবকাশ আছে। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২০৯)

(খ) পিতা-মাতা বেঁচে থাকলে তাঁদের জ্ঞাতস্বারে যাকাত আদায় করে দিতে পারবে। আর মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে থাকলে ওয়ারিশগণের ওপর মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে সেই অসিয়ত আদায় করা আবশ্যক। অসিয়ত না করে থাকলে বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের হিস্যা থেকে স্বেচ্ছায় নফল হিসেবে আদায় করে দিলে পরকালে গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। (রদ্দুল মুহতার ২/২৭০, ফাতাওয়া রহিমিয়া ২/৭২)

প্রসঙ্গ : ওযু, নামায, নখ কাটা

মুহা: নজরুল ইসলাম
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

(ক) ওযুতে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করার সুন্নাত তরিকা কী? উভয় হাত পৃথকভাবে তিনবার করে ধৌত করবে নাকি একসাথে?

(খ) রমাজান মাসে মাগরিবের নামায ইফতারের জন্য বিলম্ব করে পড়ার হুকুম

কী?
(গ) নখ কাটার সুন্নাত তরিকা কী?
সমাধান :
(ক) ওযুতে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করার সুন্নাত তরিকা হলো, পাত্র বা হাউস থেকে ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে উভয় হাত একসাথে মলে মলে ধৌত করবে। এরূপ তিনবার করবে। উভয় হাত পৃথকভাবে তিনবার ধৌত করার প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মুহতার ১/১১২)
(খ) মাগরিবের নামায সময় হওয়ার পর তাড়াতাড়ি পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। তবে রমাজান মাসে ইফতারের প্রয়োজনে যে পরিমাণ সময় দরকার, সে পরিমাণ বিলম্ব করা জায়েয আছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৬৯, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১/৪৫)
(গ) নখ কাটা সুন্নাত, কিন্তু তার নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয়। (ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১০/৩৫৭)

প্রসঙ্গ : চুল কাটা, বর্গা
মুফতী আব্দুস সোবহান
ইসলামপুর, নরসিংদী।
জিজ্ঞাসা :
(ক) আমাদের এলাকাতে অনেকেই মাথার চুল রাখার সময় ঘাড়ের ওপরের অংশ ও কানের আশপাশ হলক্ব করে, তা কি সুন্নাত? এবং চুল রাখার সুন্নাত ও জায়েয পদ্ধতি কী?
(খ) গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি ও জমি বর্গা দেওয়া ও নেওয়ার শরয়ী পদ্ধতি জানতে চাই?

সমাধান :
(ক) মাথার চুল রাখার সময় ঘাড়ের ওপরের অংশ ও কানের আশপাশ হলক্ব করা মাকরূহে তাহরিমী তথা-নাজায়েয। মাথার চুলের ব্যাপারে সুন্নাত পদ্ধতি দুটি- ১. বাবরি রাখা। ২. হলক্ব করা তথা- মাথার সব চুল মুণ্ডানো। (শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ৩)
(খ) গরু, ছাগল ইত্যাদির বর্গার প্রচলিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয় বিধায় তা বর্জনীয়। তবে দিন, কাল, শ্রম নির্ধারণ করে ইজারার পদ্ধতি গ্রহণ করলে তা জায়েয বলে বিবেচিত হবে অথবা পশুর মূল্য নির্ধারণ করে অর্ধেক বর্গাদারের কাছে বিক্রি করে দেবে পরে তার মূল্য মাফ করে দেবে। এমতাবস্থায় উক্ত পশু দুজনের মালিকানা হিসেবে দুধ, বাছুরও লভ্যাংশ থেকে দুজনেই সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারবে। জমির মালিক ও কৃষক উভয়ে ফসলে অংশীদার হতে পারে, এমন পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেওয়া শরীয়তসম্মত। পক্ষান্তরে জমির কোনো এক নির্দিষ্ট অংশের ফসল বা ওই জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল যেমন দশ মণ বা বিশ মণ ইত্যাদি কোনো একজনের জন্য নির্ধারণ করা, যাতে অপরজন বঞ্চিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, এমন শর্ত করে বর্গা দেওয়া-নেওয়া নাজায়েয। (আল বাহরুর রায়িক ৮/২৯০, কাযিখান ৩/২২)

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়
জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান
প্রস্তুতকারক
হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩